ISSN 1991-8976

RAJSHAHI UNIVERSITY LAW JOURNAL

FACULTY OF LAW
RAJSHAHI UNIVERSITY
2007

ARTICLES

Heritance of British Colonial Press Laws and Regulations: A critical overview

Revisiting Domestic Violence as a Gross Violation of Women's Fundamental Rights to Freedom from Torture

Reviewing the Interpretation of the Inheritance Law with Special Reference to Kalala

Right to Reasonable Investigation Process in Criminal Justice in Bangladesh

General Election in Bangladesh 2001: An Evaluation

Land Administration in Ancient Bengal

Sexual Exploitation of Children: A Critical Analysis with Reference to Bangladeshi Law

Ombudsman: A means of good governance in Bangladesh

Parole: Philosophy and Operation in Bangladesh

The Legal Regime of Management and Settlement of Khas Land in Bangladesh

Women's Rights in Islamic Legal System vis-à-vis Conventional System

Statutory and Traditional Approach to and Dissolution of Marriage in Hindu Law: A Comparative Study between Bangladesh and India

Women in Islam - A Critical Analysis

Alternative Dispute Resolution (ADR) in the Legal System of Bangladesh: Successes and Challenges

Guardianship in Islam: A legal study

দাপ্তরিক গোপনীয়তা আইন ও তথ্য-অধিকার

ISSN 1991-8976

Rajshahi University Law Journal

Volume 04 2007

Faculty of Law
University of Rajshahi

Rajshahi University Law Journal 2007

Editorial Board

Editor **Dr. Begum Asma Siddiqua**
Professor, Department of Law & Justice
and
Dean, Faculty of Law, RU

Member **Dr. M. Habibur Rahman**
Professor, Department of Law & Justice, RU

Dr. Muhammad Faiz-Ud-Din
Professor, Department of Law & Justice, RU

Mr. Abu Naser Md Wahid
Associate Professor, Department of Law & Justice, RU

Dr. Mohammad Abdul Hannan
Associate Professor, Department of Law & Justice, RU

Mrs. Sayeeda Anju
Assistant Professor, Department of Law & Justice, RU

Mr. Md. Sahal Uddin
Lecturer, Department of Law & Justice, RU

Rajshahi University Law Journal
Faculty of Law
University of Rajshahi

Volume 04 2007

Published by
Dean
Faculty of Law
University of Rajshahi
Rajshahi-6205
Bangladesh

© Reserved by the Publisher

Cover Design & Printed by
Text Dot Com (TDC)
Farmgate, Motihar, Rajshahi-6212

Printed at

Padma Offset Printers, Rajshahi

Subscription Rates

For Individuals : TK 100.00 US$ 20 (without postage)
For Organisation : TK 150.00 US$ 30 (without postage)

[Published in November 2008]

Rajshahi University Law Journal 2007

Authors' Name	Article	Page
Dr. Abul Mansur Ahmed	Heritance of British Colonial Press Laws and Regulations: A critical overview	1
Dr. Afroza Begum	Revisiting Domestic Violence as a Gross Violation of Women's Fundamental Rights to Freedom from Torture	9
Dr. Begum Asma Siddiqua	Reviewing the Interpretation of the Inheritance Law with Special Reference to Kalala	25
Dr. M. Abdul Hannan	Right to Reasonable Investigation Process in Criminal Justice in Bangladesh	37
Dr. M. Anisur Rahman	General Election in Bangladesh 2001: An Evaluation	49
Md. Abdul Alim	Land Administration in Ancient Bengal	63
Md. Abdur Rahim Mia	Sexual Exploitation of Children: A Critical Analysis with Reference to Bangladeshi Law	77
Dr. Md. Ahsan Kabir & Md. Hashibul Alam Prodhan	Ombudsman: A means of good governance in Bangladesh	95
Md. Ismail Hossain	Parole: Philosophy and Operation in Bangladesh	109
Md. Khurshid Alam & Mohammad Towhidul Islam	The Legal Regime of Management and Settlement of Khas Land in Bangladesh	119
Dr. Md. Maimul Ahsan Khan	Women's Rights in Islamic Legal System vis-à-vis Conventional System	139
Md. Sahidul Islam	Statutory and Traditional Approach to and Dissolution of Marriage in Hindu Law: A Comparative Study between Bangladesh and India	161
Md. Shahidul Islam	Women in Islam - A Critical Analysis	169
Mostafa Mahmud Naser & Mohammad Sarwar Alam	Alternative Dispute Resolution (ADR) in the Legal System of Bangladesh: Successes and Challenges	181
Dr. Muhammad Faiz-ud-Din & Md. Sahal Uddin	Guardianship in Islam: A legal study	201
মুসতাক আহমেদ ও মো: সাহাল উদ্দীন	দাপ্তরিক গোপনীয়তা আইন ও তথ্য-অধিকার	211

দাপ্তরিক গোপনীয়তা আইন ও তথ্য-অধিকার

মুসতাক আহমেদ* ও মো: সাহাল উদ্দীন**

Abstract

The people of Bangladesh have very limited access to get information and randomly face difficulties to get information from government and non-government institutions. The Constitution gaurantees the freedom of speech and expression for every citizen but people right to get the access to information is hindered by government officials by showing excuse of the official secrecy act. The right to access information is not only crucial to development, democracy, accountability and effective participation, but also a fundamental human right. The right to information is necessary to expose corruption, malpractice and to promote a culture of accountability both of which are very much needed in Bangladesh. In this context, the article upholds the reality of Official Secrecy Act and how this law functions as barrier to free flow of information and development.

ভূমিকা

আজকের বিশ্বে তথ্য-অধিকার মানুষের স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকার জন্য অপরিহার্য। তথ্য-অধিকারের বিষয়টি বর্তমানে মানবাধিকার হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ, আর্ন্তজাতিক বিভিন্ন সংস্থা এবং আর্ন্তজাতিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো তথ্য জানার অধিকারের বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দেখছে। শুধু তাই নয়, সমাজবিজ্ঞানী, উন্নয়ন-বিশেষজ্ঞ, আইনবিদ, গবেষকরাও তথ্য-অধিকারের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করছেন। ফলে আর্ন্তজাতিক বিভিন্ন সংস্থায়, পৃথিবীর অনেক অঞ্চলে, বিভিন্ন দেশে তথ্য-অধিকার সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠিত আইনগুলোর নাটকীয় পরিবর্তনের প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অথচ বাংলাদেশে দাপ্তরিক গোপনীয়তা আইন-১৯২৩ তথ্য জানার অধিকারের ক্ষেত্রে অন্তরায় বলে প্রতীয়মান হচ্ছে।

তথ্যের ধারণা

বর্তমান যুগকে বলা হচ্ছে তথ্যের যুগ। আমরা যে সমাজে বসবাস করছি সে সমাজকে অভিহিত করা হচ্ছে 'তথ্য-সমাজ' হিসেবে। বর্তমান আধুনিক যোগাযোগ প্রযুক্তির যুগে তথ্যকে বলা হচ্ছে আধুনিক গণতন্ত্রের ভিত্তি। তথ্যে অবাধ প্রবাহ ছাড়া সরকারের বিভিন্ন সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ সম্পূর্ণ হয় না। সাধারণভাবে যা কিছু ব্যক্ত করা হয় তা-ই তথ্য। তথ্যকে যোগাযোগের কাঁচামাল বলা হচ্ছে। আবার ব্যক্তি, পরিবেশ, সমাজ, জাতীয় এবং আর্ন্তজাতিক অবস্থা সম্পর্কে সংবাদ, উপাত্ত, চিত্র, মতামত, মন্তব্য ইত্যাদিকে তথ্য হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে জ্ঞানের যোগাযোগকেও তথ্য বলা যায়। আইনে বলা হয়েছে, তথ্য বলতে কোনো সরকারি কর্তৃপক্ষের সম্পর্ক, প্রশাসন কিংবা কর্মকান্ড যেকোনো বস্তু বা তথ্যকে বোঝায়, এবং যেকোনো যোগাযোগ, স্মারক, বই, নকশা, মানচিত্র, অঙ্কন, অঙ্কিতচিত্র, সচিত্র বা

* সহকারী অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী-৬২০৫।

** সহকারী অধ্যাপক, আইন ও বিচার বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী-৬২০৫।

লৈখিক কর্ম, ছবি, ফিল্ম, মাইক্রোফিল্ম, ধারণকৃত শব্দ, চলচ্চিত্র, যান্ত্রিকভাবে পাঠযোগ্য কোনো তথ্য এবং ভৌতিক গঠন ও বৈশিষ্ট্য নির্বিশেষে অন্য যে কোনো তথ্যবহ বস্তু এবং এদের নকলকে অর্ন্তভূক্ত করে[১]। Black's law dictionary (5th Edition) defines the term information as "an accusation exhibited against a person for some criminal offense, without an indictment." The term "information" is further described therein as "an accusation in the nature of an indictment, from which it differs only in being presented by a competent public officer on his oath of office, instead of a grand jury on their oath." The term is further defined as a "written accusation made by a public prosecutor, without the intervention of grand jury[২]."

অধিকার

অধিকার বিষয়টিকে সংজ্ঞা দ্বারা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। সাধারণভাবে অধিকার বলতে বুঝায় এমন কিছু যা মানুষ হবার কারণে একজন ন্যায্যভাবে দাবী করতে পারে। মানুষ ন্যায্যভাবে যা কিছু পাবার যোগ্য তাই হলো অধিকার। কারণ অধিকার হলো এমন কিছু ক্ষমতা যা মানুষ তার বিশেষ অবস্থানের কারণে ভোগ করে থাকে[৩]। অন্যভাবে বলা যায়, অধিকার বলতে মানুষের বিকাশের জন্য কিছু সুযোগ-সুবিধার দাবিকে বুঝায় যে দাবির নৈতিক কিংবা আইনগত ভিত্তি থাকে।

আইনগত দৃষ্টিকোণ থেকে অধিকার বলতে আইন দ্বারা স্বীকৃত একজন ব্যক্তির কোনো কিছু করার স্বাধীনতা, কোনো কিছু নিজের অধীনে রাখা বা অন্যের কাছ থেকে কোনো কিছু গ্রহণ করাকে বুঝায়। আইনের ভাষায় বলা যায়, অধিকার হলো একটি স্বার্থ যা সংবিধান বা সাধারণ আইন দ্বারা সৃষ্ট হয়। প্রথমটির ক্ষেত্রে তা সাংবিধানিক অধিকাররূপে পরিচিত যা কেবলমাত্র সংবিধান সংশোধন সাপেক্ষে পূরণ করা যায়। দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে তা সাধারণ অধিকাররূপে পরিচিত যাকে সাধারণ আইন দ্বারা বিস্তৃত অথবা বিনষ্ট করা যায়[৪]।

তথ্য-অধিকার

তথ্যের অধিকার শুধু গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার জন্যই গুরুত্বপূর্ণ নয়, এটা মানুষের অংশগ্রহণের অধিকার ও উন্নয়নের অধিকারের উপলব্ধির জন্যও গুরুত্বপূর্ণ।[৫] জেমস ম্যাডিসন মনে করেন, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় জনগণের তথ্য সংগ্রহের অধিকার একটি নাগরিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তথ্য জানার অধিকারকে আইনে পরিণত করা হয়েছে। তথ্য অধিকারের অন্তর্নিহিত অর্থ হলো জনপর্ষদগুলো এধরনের সুনির্দিষ্ট ও জনকল্যাণমূলক বিষয়ে বিস্তৃতভাবে নথি প্রকাশ ও প্রচার করবে। যেমন, তাদের কার্যক্রম সম্পর্কিত তথ্য। এছাড়া রাষ্ট্রের কাছ থেকে তথ্য পাওয়ার অধিকার তথ্য অধিকারের অর্ন্তভূক্ত। আইনে বলা হয়েছে তথ্য-অধিকার বলতে তথ্য প্রাপ্তির অধিকারকে বোঝায় এবং কোনো সরকারি কর্তৃপক্ষের

---

১ ভবেশ দাস ও রোবায়েত ফেরদৌস, সম্পা. (২০০৭), 'প্রস্তাবিত 'তথ্য অধিকার আইন- ২০০২' বিষয়ক কর্মপত্র', *তথ্যের অধিকার*, চারদিক, ঢাকা, পৃ.৫৬৭।

২ *Salvail v. Sharkey*, 271 A. 2d 814, 817.

৩ উন্নয়ন পদক্ষেপ, সংখ্যা ৩০, পৃ. ৪৬।

৪ ড. এ. বি. এম. মফিজুল ইসলাম পাটোয়ারী ও মো. আখতারুজ্জামান (২০০১), *মানবাধিকার ও আইনগত সহায়তাদানের মূলনীতি*, এইচইএবি, ঢাকা, পৃ. ১।

৫ http://www.hri.ca

দলিলপত্রের তদন্ত, সংক্ষিপ্ত তথ্য লিপিবদ্ধকরণ, সারমর্ম এবং ফটোকপি বা সত্যায়িত নকল পাওয়ার অধিকারকে অর্ন্তভূক্ত করে[৬]।

মানবাধিকার

১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ মানবাধিকারের যে সার্বজনীন ঘোষণাপত্র গ্রহণ ও জারি করে সেটি ছিল মানবাধিকারের প্রথম আর্ন্তজাতিক দলিল। এ দলিলের সূত্র ধরেই পরবর্তীকালে বিভিন্ন সময়ে মানবাধিকারের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে জাতিসংঘ দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করে।

বলা হচ্ছে আইনগত ও নৈতিক অধিকারগুলোর মধ্যে সেইগুলোই মানবাধিকার হিসেবে চিহ্নিত যেগুলো পৃথিবীর সকল মানুষ শুধু মানুষ হিসেবে দাবী করতে পারে[৭]। তথ্যের অধিকারকে মানবাধিকার হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তথ্য অধিকারের স্বাধীনতা কিংবা অবাধ তথ্যের প্রবাহ ব্যতীত মানবাধিকার ব্যবস্থা কাজ করতে পারে না। সেই অর্থে তথ্যে অধিকার হচ্ছে মানবাধিকারের ভিত্তি, যার উপর অন্য সব অধিকার নির্ভরশীল। সুতরাং বলা যায়, গণতান্ত্রিক সমাজে তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত। অথচ বাংলাদেশের দাপ্তরিক গোপনীয়তা আইন সেই অধিকার স্বীকার করে না।

রাষ্ট্রীয় গোপন খবর জনগনের নিকট প্রকাশ পেলে নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব ক্ষুন্ন হবে এই অজুহাতে, সরকারি দলিল দস্তাবেজ গোপন রাখার জন্য ১৯২৩ সালে একটি আইন পাশ করা হয়। যা দাপ্তরিক গোপনীয়তা আইন নামে পরিচিত। এতে গোপন তথ্য আদান প্রদানের ক্ষেত্রে বিচার, শাস্তি এবং দন্ড সম্পর্কে বিধান রয়েছে। যা আমাদের দেশে আজও বিদ্যমান। অথচ বর্তমান বাস্তবতায় এ আইনের ধারণা অনেকাংশেই অচল। বর্তমান প্রবন্ধে দাপ্তরিক গোপনীয়তা আইনের বিভিন্ন ধারা ও বাংলাদেশে তথ্য-অধিকারের ক্ষেত্রে এর নেতিবাচক দিকগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে।

দাপ্তরিক গোপনীয়তা আইনের ইতিহাস

দাপ্তরিক গোপনীয়তা আইন উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত একটি আইন। এই আইনটি সরাসরি গণমাধ্যম, সাংবাদিক, সরকারী তথ্য-প্রাপ্তি সংক্রান্ত বিষয়ের সাথে যুক্ত। শুরু থেকেই গণমাধ্যমের সাথে শাসকদের সম্পর্ক দ্বন্দ্ব আর সংঘাতের। আজও এ সম্পর্কের উন্নতি হয় নি। উপমহাদেশে সংবাদপত্রের ইতিহাস ও সাংবাদিকের কণ্ঠরোধের ইতিহাস সমান্তরালভাবে এগিয়েছে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে শৃঙ্খলিত করার জন্য ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী তাদের সকল শক্তি ও কুটকৌশল প্রয়োগ করেছেন। সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করতে জারি করেছেন একের পর এক তথ্য-বিধ্বংসী আইন। মির্জা বেদার বখত নামে এক মুসলিম সম্পাদকের শরীরে হারাম জন্তুর চর্বি মেখে তাকে ফাঁসির দড়িতে পর্যন্ত ঝুলিয়েছিলেন সেদিনের ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী। ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীর বিরোধীতাকারী পত্রিকার পাঠককে ফাঁসির দড়িতে ঝুলতে হয়েছিল[৮]।

---

৬ ভবেশ দাস ও রোবায়েত ফেরদৌস, সম্পা. (২০০৭), 'প্রস্তাবিত 'তথ্য অধিকার আইন- ২০০২' বিষয়ক কর্মপত্র', তথ্যের অধিকার, চারদিক, ঢাকা, পৃ. ৫৬৭।

৭ এমএমসি (২০০৩), অফিসিয়াল সিক্রেসী অ্যাক্টঃ সাংবোদিকদের প্রবেশগম্যতা, ঢাকা, পৃ. ১৪।

৮ মো. খুরশিদ আলম (১৯৯২), *সংবাদপত্রের স্বাধীনতা*, সুবর্ণ, পৃ. ৮২।

উপমহাদেশে প্রথম সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠাতা জেমস অগাস্টাস হিকি। হিকি পেশায় একজন মুদ্রণ ব্যবসায়ী। ১৭৭৮ সালে তিনি কলকাতায় একটি ছাপাখানা স্থাপন করেন এবং তার উদ্যোগে ১৭৮০ সালের ২৯ জানুয়ারি শনিবার উপমহাদেশের প্রথম মুদ্রিত সংবাদপত্র *দি বেঙ্গল গেজেট* বা *ক্যালকাটা জেনারেল অ্যাডভর্টাইজার* এর সূচনা হয়। হিকির সংবাদপত্রে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলাদের কঠোর ভাষায় সমালোচনা করা হতো। তিনি গর্ভনর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস ও তার স্ত্রীকেও ছেড়ে কথা বলেন নি। পোস্ট অফিসের মাধ্যমে হিকি যে সুযোগ পেয়েছিলেন কোম্পানি তা প্রত্যাহার করে নেয় এবং হিকির বিরুদ্ধে মানহানি মামলা করা হয়, তাকে দেশত্যাগে বাধ্য করা হয়[৯]।

এসময় সংবাদপত্রের উপর দুভাবে শাস্তি নেমে আসতোঃ

ক) সম্পাদকদের নিজ দেশে ফেরত পাঠানো অথবা

খ) সংশ্লিষ্ট পত্রিকাকে ডাক বিভাগের খরচা সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা।

সংবাদপত্র প্রকাশের ব্যাপারে কোনো আইন বা বিধি না থাকায় এ অবস্থা চলছিল বেশ কয়েক বছর। ১৭৯৯ সালে প্রথম কতকগুলো বিধি তৈরি করে বলা হলো যে, প্রত্যেক সংবাদপত্রে প্রকাশকের নাম ও সম্পাদকের নাম ছাপতে হবে এবং ছাপার বিষয়গুলো প্রি–সেন্সরশীপের জন্য পেশ করতে হবে। এই বিধি লঙ্ঘনের শাস্তি নির্বাসন। লর্ড হেস্টিংস এই প্রি–সেন্সরশীপ প্রথা রহিত করেন এবং এই বিধি জারি করেন যে, জনস্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর অথবা সরকারের কর্তৃত্ব আক্রান্ত হয় এমন কিছু প্রকাশ করলে তার জন্য সম্পাদক আইনত দায়ী থাকবেন।

লর্ড বেনটিং এবং স্যার চার্লস মেটকাফের কার্যকালে সংবাদপত্রের প্রতি অনেকটা উদার দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা হয়। ফলে ১৮২৩ সালের বেঙ্গল রেগুলেশনস এবং ১৮২৫ ও ১৮২৭ সালের বোম্বে প্রেস রেগুলেশন রহিত করা হয়। ইষ্ট ইন্ডয়া কোম্পানিভূক্ত সকল এলাকার জন্য প্রযোজ্য একটি নতুন আইন প্রণীত হয়। নতুন আইনে সম্পাদক, মুদ্রাকর এবং প্রকাশককে কেবল প্রকাশের স্থান সম্পর্কে একটি ঘোষণা দেয়ার বিধান করা হয়।

ইংরেজদের ভাবিয়ে তোলে ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহ। ইংরেজ শাসকরা সংবাদপত্র কঠোর নিয়ন্ত্রণের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা হিসেবে লর্ড ক্যানিং-এর সুপারিশ অনুযায়ী ১৮৫৭ সালে একটি আইন প্রণীত হয়। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় স্বাধীনতার সমর্থন করে এমন সংবাদপত্রসমূহের প্রকাশনা বন্ধ করা। কিন্তু উনিশ শতকের শেষ দিকে দ্রুত গড়ে ওঠা স্থানীয় সংবাদপত্রসমূহ ঔপনিবেশিক শাসকদের জন্য আরও বেশি হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। আর তারই ফলে ১৮৭৮ সালের ১৪ মার্চ জারি করা হয় ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট। এই কঠোর আইনটি এমনভাবে প্রণীত হয়, যা সরকারকে কেবলমাত্র সন্দেহের ভিত্তিতে প্রেস বাজেয়াপ্ত করার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দেয়।

বিশ শতকের শুরুতে ইংরেজ শাসকরা সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের জন্য নানা রকম কুট-কৌশল চালিয়ে যেতে থাকে। তার প্রমাণ ১৯০৮ সালের নিউজপেপার অ্যাক্ট ও ১৯১০ সালের প্রেস অ্যাক্ট জারি। এই দুটি আইন ১৯২২ সাল পর্যন্ত টিকে ছিল। এর পর সমস্যায় পরে লর্ড অ্যালেনবরো নির্দেশ জারি করেন, সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের পূর্ব অনুমতি ছাড়া সরকারী দলিলপত্র এবং কাগজপত্র কোনো অবস্থাতেই প্রকাশ করা যাবে না

---

৯ রোবায়েত ফেরদৌস ও মীর মোশারেফ হোসেন (২০০২), *প্রান্তজন*, সংখ্যা-২, এমএমসি, ঢাকা, পৃ. ৮।

অথবা কাউকে দেয়া যাবে না। এভাবে তিনি সরকারী গোপন তথ্যাদি ফাঁস করা থেকে সরকারী আমলাদের বিরত করেন এবং এই ধারাবাহিকতায় প্রণীত হয় অফিসিয়াল সেক্রেসি অ্যাক্ট বা 'দাপ্তরিক গোপনীয়তা আইন'। এটি ১৯২৩ সালের ১৯ নং আইন হিসেবে পরিচিত[১০]।

দাপ্তরিক গোপনীয়তা আইন

(১৯২৩ সালের ১৯ নং আইন)

দাপ্তরিক গোপনীয়তা আইন নিম্নোক্তরূপে বিধিবদ্ধ করা হলো:

১. সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, আওতা ও প্রয়োগ

(১) এই আইনকে দাপ্তরিক গোপনীয়তা আইন, ১৯২৩ বলা হবে।

(২)এই আইনের আওতা সমগ্র বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের সকল নাগরিক ও প্রজাতন্ত্রের চাকরিতে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের জন্য প্রযোজ্য, তারা যেখানেই থাকুক না কেন।

২. সংজ্ঞা। বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকলে এই আইনে–

(১) সরকারের মালিকানার কোনো স্থানের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা থাকলে, স্থানটি প্রকৃতপক্ষে সরকারের ওপর অর্পিত হোক বা না হোক তা সরকারের যেকোনো বিভাগের দখলাধীন স্থান অভিব্যক্তি হিসেবে অর্ন্তভূক্ত হবে;

(২) যোগাযোগ বা গ্রহণ প্রসঙ্গে অভিব্যক্তি যে কোনো যোগাযোগ করা বা গ্রহণ করা অর্ন্তভূক্ত করবে তা সম্পূর্ণ বা আংশিক এবং প্ল্যান, মডেল, রচনা, নোট নথি বা দলিল কিংবা সম্পূর্ণ তথ্য বা সারাংশ তৎসংক্রান্ত ফল বা বর্ণনা মাত্র জ্ঞাপিত বা গৃহীত, কোনো নকশা প্ল্যান, মডেল, রচনা, নোট বা নথি সম্পূর্ণ বা আংশিক নকল করার বা নকলের চেষ্টা করা এর অর্ন্তভূক্ত এবং নকশা প্ল্যান, মডেল, রচনা, নোট বা নথিপত্রের অন্যান্য যোগাযোগ সংক্রান্ত বর্ণনায় নকশা প্ল্যান, মডেল, রচনা, নোট বা নথিপত্রের হস্তান্তর বা সরবরাহ করা অর্ন্তভূক্ত।

(৩) 'সরকারের অধীনস্ত দপ্তর' অভিব্যক্তিতে সরকারের যে কোনো বিভাগের কার্যালয় কিংবা সরকারের যে কোনো বিভাগ বা বিভাগের অধীন কোনো চাকুরি অর্ন্তভূক্ত।

(৪) 'আলোকচিত্র' অভিব্যক্তিতে ডেভেলপ না করা ফিল্ম কিংবা প্লেট অর্ন্তভূক্ত।

(৫) 'নিষিদ্ধ স্থান' অর্থ

(ক) প্রতিরক্ষা, অস্ত্রাগার, নৌবাহিনী, সেনাবাহিনী ও বিমান বাহিনীর স্থাপনা বা নির্দিষ্ট স্থান, মাইন ক্ষেত্র, ছাউনি, জাহাজ বা বিমান যা সরকারের বা সরকারের পক্ষে মালিকানাভূক্ত কিংবা অধিকারভূক্ত; একইভাবে মালিকানাভুক্ত কিংবা অধিকারভূক্ত কোনো সামরিক টেলিগ্রাফ বা টেলিফোন; একইভাবে মালিকানভূক্ত বা অধিকারভূক্ত যে কোনো ওয়্যারলেস বা সিগন্যাল স্টেশন; একইভাবে মালিকানভূক্ত বা অধিকারভূক্ত যে কোনো কারখানা, ডকইয়ার্ড বা অন্য কোনো স্থান যা কোনো যুদ্ধাস্ত্র তৈরি, মেরামত, মজুদ রাখার কাজে ব্যবহার হয়, কিংবা এই সংক্রান্ত কোনো নকশা, প্ল্যান মডেল, বা নথিপত্র কিংবা যুদ্ধের সময় ব্যবহারের জন্য কোনো ধাতু, তেল বা অন্য কোনো খনিজদ্রব্য লাভের নথিপত্র;

---

১০ আবু নছর মো. গাজীউল হক (১৯৯৬), *বাংলাদেশের গণমাধ্যম আইন ও বিধিমালা*, ইউপিএল, ঢাকা।

(খ) সরকারের মালিকানধীন নয় এমন কোনো স্থান যেখানে, সরকারের সাথে কিংবা সরকারের পক্ষে কোনো ব্যক্তির সাথে, কিংবা সরকারের পক্ষে অন্য কোনোভাবে চুক্তির অধীনে কোনো যুদ্ধসরঞ্জাম বা সেই সংক্রান্ত কোনো নকশা, মডেল, প্ল্যান, বা নথিপত্র তৈরি করা হয়, মেরামত করা হয়, পাওয়া যায় কিংবা সংরক্ষিত হয়;

(গ) সরকারের মালিকানধীন কিংবা সরকারের কাজে ব্যবহার করা কোনো স্থান যা সরকার এই আইনের উদ্দেশ্যে গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সাময়িকভাবে এই কারণে নিষিদ্ধ স্থান ঘোষণা করেছেন যে, এই স্থান সংক্রান্ত কোনো তথ্য সরবরাহ কিংবা এই স্থানের ক্ষতিসাধন কোনো শত্রুর জন্য লাভজনক হবে এবং এতদসংক্রান্ত একটি বিজ্ঞপ্তির কপি ইংরেজি ও বাংলায় তদস্থলে লটকিয়ে দেয়া হয়েছে;

(ঘ) রেল, সড়ক, বা নদীপথ কিংবা অন্যান্য স্থল বা নৌ যোগাযোগ ব্যবস্থা এর অংশ বিশেষ বা এর সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো পূর্ত কাজ বা কাঠামো, কিংবা গ্যাস, পানি, বা বিদ্যুৎ, পূর্তকাজ কিংবা জনসাধারণের ব্যবহার উপযোগী অন্যান্য কাজে ব্যবহার্য কানো স্থান, কিংবা এমন কোনো স্থান যেখানে সরকারের পক্ষ থেকে না হলেও অন্য কোনো ব্যবস্থাপনায় কোনো যুদ্ধাস্ত্র বা কোনো নকশা, মডেল, প্ল্যান, বা নথিপত্র তৈরি করা হয়, মেরামত করা হয় বা মজুদ করা হয় যে স্থানটিকে সরকার এই আইনের উদ্দেশ্যেগেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সাময়িকভাবে এই কারণ প্রদর্শন করে নিষিদ্ধ স্থান ঘোষণা করেছেন, এই স্থান সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহে কিংবা এই স্থানের ক্ষতিসাধনে কোনো শত্রু লাভবান হবে এবং এতদসংক্রান্ত একটি বিজ্ঞপ্তির কপি ইংরেজি ও বাংলায় তদস্থলে লটকিয়ে দেয়া হয়েছে।

তবে শর্ত থাকে যে, উপ-দফা (গ) বা উপ–দফা (ঘ)-এর অধীনে কোনো নিষিদ্ধ স্থান ঘোষণার জন্য সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তি প্রদান রাষ্ট্রের নিরাপত্তার স্বার্থে কাম্য বিবেচিত হবে না, একই ধরনের ঘোষণা কোনো আদেশের মাধ্যমে দেয়া যেতে পারে এবং একই আদেশের কপি বা এই সংক্রান্ত নোটিশ নিষিদ্ধ স্থানটির প্রবেশ পথে কিংবা কোনো দৃষ্টি আকর্ষক স্থানে ঝুলিয়ে বিশেষভাবে প্রদর্শিত হবে।

(৬) 'স্কেচ' অভিব্যক্তিতে যে কোনো আলোকচিত্র কিংবা কোনো স্থান বা বস্তুর প্রতিরূপ প্রদানের অন্যান্য উপায় অর্ন্তভূক্ত।

(৭) 'সুপারিনটেনডেন্ট অফ পুলিশ' অভিব্যক্তিতে এই পদমর্যাদার কিংবা এর উপরের পদমর্যাদার কোনো পুলিশ কর্মকর্তা এবং অন্য কোনো ব্যক্তি যাকে সরকার এই আইনের উদ্দেশ্যে একজন পুলিশ সুপারের ক্ষমতা অর্পণ করেন, অর্ন্তভূক্ত।

৩. গুপ্তচর বৃত্তির জন্য দন্ড

(১) যদি কোনো ব্যক্তি রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বা স্বার্থের প্রতি ক্ষতিকর কোনো উদ্দেশ্যে–

(ক) কোনো নিষিদ্ধ এলাকায় গমন করে কিংবা পরিদর্শন করে, কিংবা নিষিদ্ধ স্থানটির কাছে যায় বা প্রবেশ করে; কিংবা

(খ) নকশা, প্ল্যান, মডেল বা বিবরণ তৈরি করে যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো শত্রুর কাজে লাগানোর জন্য করা হয় বা কাজে লাগতে পারে এই উদ্দেশ্যে করা হয়;

(গ) কোনো গোপন সরকারী সংকেত গ্রহণ, সংগ্রহ, লিপিবদ্ধ, প্রকাশ কিংবা অন্য কোনো ব্যক্তির কাছে তা জ্ঞাত করে, কিংবা কোনো নকশা, মডেল, প্ল্যান, সামগ্রী বা তথ্য বা অন্য কোনো নথি বা তথ্য অন্য

কোনো ব্যক্তির কাছে সরবরাহ করে, যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো শত্রুর কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে নিয়ে করা হয়;

তাকে এই ধারার অধীনে দোষী সাব্যস্ত করা হবে।

(২) এই ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য ১৪ বছর পর্যন্ত কারাদন্ডের বিধান সম্বলিত কোনো অপরাধের বিচারে এটি দেখানো জরুরী নয় যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বা স্বার্থের প্রতি ক্ষতিকর কোনো উদ্দেশ্য কোনো বিশেষ কাজ করার জন্য দোষী। তার বিরুদ্ধে এই ধরনের কোনো কাজের অভিযোগ প্রমাণিত না হলেও সে দন্ডিত হতে পারে, যদি মোকদ্দমার অবস্থায় তার আচরণ বা জ্ঞাত পূর্বচরিত্র থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তার উদ্দেশ্য রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও স্বার্থের প্রতি ক্ষতিকর ছিল; এবং যদি কোনো নকশা, প্ল্যান, মডেল, সামগ্রী, তথ্য, দলিল, কিংবা কোনো নিষিদ্ধ স্থানে ব্যবহৃত বা নিষিদ্ধ স্থান সংশ্লিষ্ট, কিংবা এ ধরনের কোনো স্থানের কোনো কিছু বিষয়ক তথ্য কিংবা কোনো গোপন সরকারী সংকেত বা সংকেত শব্দ বৈধ কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্মরত কোনো ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারো কাছে সরবরাহ করা হয়, কিংবা এই ধরনের কিছু গ্রহণ, সংগ্রহ, লিপিবদ্ধ বা প্রকাশ করে এবং মামলার অবস্থা তার আচরণ বা তার জ্ঞাত পূর্বচরিত্র থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তার রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও স্বার্থের প্রতি ক্ষতিকর ছিল তাহলে মনে করা হবে যে, ঐ ধরনের নকশা, প্ল্যান, মডেল, সামগ্রী, টীকা, দলিল, তথ্য রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বা স্বার্থের প্রতি ক্ষতিকর কোনো উদ্দেশ্যে গ্রহণ, সংগ্রহ, লিপিবদ্ধ বা প্রকাশ করা হয়েছে কিংবা সরবরাহ করা হয়েছে।

(৩) এই ধারার অধীনে কোনো অপরাধের জন্য কোনো ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত হলে–

(ক) যেখানে সংঘটিত অপরাধ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যদি কোনো বিদেশী শক্তির স্বার্থে বা কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে করা হয়েছে কিংবা সংঘটিত অপরাধ প্রতিরক্ষা, অস্ত্রাগার, নৌবাহিনী, সেনাবাহিনী ও বিমান বাহিনীর স্থাপনা বা নির্দিষ্ট স্থান, মাইন ক্ষেত্র, ছাউনি, জাহাজ বা কারখানা, ডকইয়ার্ড বা বিমান কিংবা বাংলাদেশের নৌ, সেনা, বা বিমান বাহিনী সম্পর্কিত কিংবা কোনো গোপন সরকারী দাপ্তরিক সংকেত সম্পর্কিত হয় সেই ক্ষেত্রে মৃত্যুদন্ড বা ১৪ বছর পর্যন্ত কারাদন্ড; এবং

(খ) অন্য কোনো অপরাধের জন্য ৩ বছর পর্যন্ত কারাদন্ড।

৩ ক. নিষিদ্ধ ঘোষিত ও প্রজ্ঞাপিত স্থানসমূহের আলোকচিত্র, নকশা ইত্যাদির ব্যাপারে বিধিনিষেধ।

(১) সরকারের দ্বারা বা পক্ষ থেকে লিখিত অনুমতিপত্রের ক্ষমতা ব্যতীত কোনো ব্যক্তি সরকার কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত কোনো নিষিদ্ধ এলাকা বা স্থান কিংবা এ ধরনের অংশ বিশেষ বা কোনো বস্তু, বাংলাদেশের নিরাপত্তার স্বার্থে যেগুলোর ব্যাপারে এই ধরনের বিধিনিষেধ সরকারের কাছে যুক্তিযুক্ত মনে হয়েছে সেগুলোর কোনো আলোকচিত্র গ্রহণ, নকশা, প্ল্যান, মডেল, টীকা কিংবা এগুলোর সম্যক প্রতিরূপ দেয়ার মত কোনো ধরনের কিছু তৈরি করতে পারবে না।

(২) সরকার সাধারণ বা বিশেষ আদেশের মাধ্যমে এই বিষয়টি নিশ্চিত করার ব্যবস্থা করতে পারেন যে, উপ-ধারা (১) এর অধীনে প্রদত্ত অনুমতিপত্রের বলে গৃহীত বা প্রণীত কোনো লোকচিত্র গ্রহণ, নকশা, প্ল্যান, মডেল, টীকা বা এগুলো তুলে ধরার মত অন্য কিছু আদেশে উল্লিখিত কর্তৃপক্ষ বা ব্যক্তির কাছে পেশ না

করা ও অনুমোদন না দেয়া পর্যন্ত তা প্রকাশ করা যাবে না এবং এই কর্তৃপক্ষ বা ব্যক্তি এইগুলি তাদের কাছে রেখে দিতে কিংবা বিনষ্ট করে ফেলতে কিংবা অন্য কোনোভাবে ব্যবস্থা করতে পারেন।

(৩) কোনো ব্যক্তি এই ধারার কোনো বিধান লঙ্ঘন করলে তার সর্বোচ্চ ৩ বছর কারাদণ্ড বা জরিমানা কিংবা উভয় দণ্ড হতে পারে।

৪. বিদেশী এজন্টদের সাথে যোগাযোগ কতিপয় অপরাধ সংঘটনের সাক্ষ্য-প্রমাণ হিসেবে গণ্য হবে–

(১) ধারা ৩-এর অধীনে কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলার অভিযোগ থাকে যে, ঐ ব্যক্তির বাংলাদেশের ভিতরে বা বাইরে বিদেশী এজেন্ট বা এজেন্টদের সংগে যোগাযোগ রয়েছে কিংবা সে যোগাযোগের চেষ্টা করছে সে ক্ষেত্রে এ বিষয়টি প্রমাণ করা প্রাসঙ্গিক হবে যে, সে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বা স্বার্থের প্রতি ক্ষতিকর উদ্দেশ্যে তথ্য লাভ করেছে বা লাভের চেষ্টা করছে যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শত্রুর কাজে লাগানোর জন্য করা হয়েছে , করা হতে পারে কিংবা উক্ত উদ্দেশ্য নিয়ে করা হয়েছে।

(২) পূর্বের বিধানসমূহের সার্বজনীনতা ক্ষুণ্ন না করে এ ধারার অভিপ্রায় হবে –

(ক) কোনো ব্যক্তির কোনো বিদেশী এজেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে বলে মনে করা যেতে পারে, যদি–

(১) সে বাংলাদেশের ভিতরে বা বাইরে, তার কাছে কোনো বিদেশী এজেন্টের ঠিকানায় যাতায়াত করে, কিংবা বিদেশী এজেন্টের সহগামী হয় বা তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে; কিংবা

(২) বাংলাদেশের ভিতরে বা বাইরে, তার কাছে কোনো বিদেশী এজেন্টের নাম বা ঠিকানা, কিংবা এজেন্ট সম্পর্কে অন্য কোনো তথ্য পাওয়া যায়, কিংবা কোনো লোকের নিকট থেকে সে তা গ্রহণ করে;

(খ) 'বিদেশী এজেন্ট' বলতে এমন এক ব্যক্তিকে বোঝাবে যে অথবা যার সম্বন্ধে প্রতীয়মান হচ্ছে বা হয়েছে যে, সে বাংলাদেশের ভিতরে বা বাইরে রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য ক্ষতিকর কোনো কার্য সংঘটনের উদ্দেশ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো বিদেশী শক্তির দ্বারা নিয়োজিত হয়েছে বলে সন্দেহ করার যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে কিংবা যুক্তিসঙ্গতভাবে সন্দেহ করা হয়েছে বা হচ্ছে বা সে কোনো বিদেশী শক্তির স্বার্থে এই ধরনের কোনো কাজ সংঘটিত করেছে বা করার চেষ্টা করছে;

(গ) কোনো ঠিকানা, তা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বা বাইরে, যার সম্পর্কে প্রতীয়মান হয় যে, তা বিদেশী এজেন্টের জন্য যোগাযোগ করার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় বলে সন্দেহ করার যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে, কিংবা কোনো ঠিকানা যেখানে বিদেশী এজেন্ট অবস্থান করে কিংবা সংবাদ আদান প্রদান করার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে বা যেখানে সে ব্যবসা-কার্য পরিচালনা করে তাকে কোনো বিদেশী এজেন্টের ঠিকানা বলে ধরে নেয়া যেতে পারে এবং এই ধরনের কোনো ঠিকানায় যোগাযোগকে কোনো বিদেশী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ বলে বিনা প্রমাণে গ্রহণ করা যেতে পারে।

৫. তথ্যের বে-আইনি আদান-প্রদান ইত্যদি।

(১) কোনো ব্যক্তির কাছে বা নিয়ন্ত্রণে যদি কোনো গোপন সরকারি বা দাপ্তরিক সংকেত বা সংকেত শব্দ কিংবা কোনো নকশা, প্ল্যান, মডেল, সামগ্রী, নোট, নথি, কিংবা এ ধরনের কোনো স্থানের কোনো কিছুর সাথে সম্পর্কিত কিংবা যা এই আইন লঙ্ঘণ করে প্রস্তুত এবং গ্রহণ করা হয়েছে , কিংবা সরকারের অধীনে কর্মরত কোনো কর্মকর্তা গোপনে তাকে সেই কাজের দায়িত্ব প্রদান করেছেন, কিংবা সে নিজে সরকারের অধীনে পূর্বে বা বর্তমানে দায়িত্ব পালন সূত্রে এগুলো লাভ করেছেন বা এ সম্পর্কে জ্ঞাত

হয়েছেন কিংবা সরকারের পক্ষে সম্পাদিত চুক্তিতে আবদ্ধ কোনো ব্যক্তি হিসেবে, কিংবা পূর্বে বা বর্তমানে এমন কোনো ব্যক্তির অধীনে কর্মরত ব্যক্তি হিসেবে এগুলো প্রাপ্ত হয়েছেন এবং বর্তমানে বা আগে এই ধরনের পদে বা চুক্তির ভিত্তিতে নিযুক্ত রয়েছে বা ছিল, সে যদি –

(ক) স্বেচ্ছায় এই সংকেত বা সংকেত শব্দ, প্ল্যান, মডেল সামগ্রী, নোট, নথি বা তথ্য অনুমোদিত ব্যক্তি, আদালত কিংবা রাষ্ট্রের স্বার্থে যাকে তার জানানো কর্তব্য, এমন কোনো ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তিকে জানিয়ে দেয়; কিংবা

(খ) তার কাছে রাখা কোনো বিদেশী শক্তির স্বার্থের জন্য, কিংবা রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য ক্ষতিকর অন্য কোনো ভাবে ব্যবহার করে; কিংবা

(গ) নকশা, প্ল্যান,মডেল, সামগ্রী, নোট বা নথিপত্র তার নিজের কাছে বা নিয়ন্ত্রণে রাখে, যখন সেগুলো রাখার কোনো অধিকার তার তার নাই কিংবা সেগুলো রাখা তার দায়িত্বের পরিপন্থি, কিংবা সে যদি সেগুলো ফিরিয়ে দেয়ার বা হস্তান্তর করার ব্যাপারে বৈধ কর্তৃপক্ষের দেয়া সকল নির্দেশ পালন করতে ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যর্থ হয়; কিংবা

(ঘ) উপযুক্ত সতর্কতা বা যত্ন নিতে ব্যর্থ হওয়ায় যদি নকশা, প্ল্যান, মডেল, সামগ্রী, নোট, দলিল গোপন সরকারী সংকেত বা সংকেত শব্দ কিংবা তথ্যের নিরাপত্তা বিপন্ন হয়, অহলে সে এই ধারার অধীনে অপরাধের জন্য দোয়ী সাব্যস্ত হবে;

(২) কোনো ব্যক্তি যদি কোনো গোপন সরকারী বা দাপ্তরিক সংকেত কিংবা কোনও নকশা, প্ল্যান, মডেল, বস্তু, টীকা, নথি বা তথ্য স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে এবং করার সময় এই বিষয়টি তার জানার থাকে, কিংবা জানা আছে বলে বিশ্বাস করার যুক্তিযুক্ত কারণ রয়েছে যে, এই সংকেত, সংকেত শব্দ, নকশা, প্ল্যান, মডেল বস্তু, টীকা, নথি বা তথ্য এই আইন লঙ্ঘন করে কারো কাছে সরবরাহ করেছে তবে, সে এই ধারার অধীনে অপরাধ সংঘটন করার জন্য দোষী সাব্যস্ত হবে।

(৩) এই ধারার অধীনে অপরাধের জন্য কোন ব্যক্তি শাস্তিযোগ্য হবে–

(ক) যখন সংঘটিত অপরাধ উপধারা (১) এর দফা (ক) লঙ্ঘন করে করা হয় এবং তা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো বিদেশী শক্তির স্বার্থে বা কাজে লাগাবার উদ্দেশ্যে করা হয়, কিংবা সংঘটিত অপরাধ প্রতিরক্ষা, অস্ত্রাগার, নৌবাহিনী, বিমান বাহিনী বা সেনাবাহিনীর স্থাপনা বা স্টেশন, মাইন ক্ষেত্র, কারখানা, ডকইয়ার্ড, ছাউনি, জাহাজ, বিমান কিংবা বাংলাদেশের নৌ, সেনা বা বিমানবাহিনী বিষয়ক, কিংবা কোনো গোপন সরকারী বা দাপ্তরিক সংকেত বিষয়ক হয়, সেক্ষেত্রে অপরাধীর মৃত্যুদণ্ড বা ১৪ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হতে পারে; এবং

(খ) অন্য কোনো অপরাধের জন্য বিচারে ২ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা জরিমানা কিংবা উভয় দণ্ড হতে পারে।

৬. উর্দির অবৈধ ব্যবহার, মিথ্যা প্রতিবেদন প্রস্তুত করা, জালিয়াতি করা, ভূয়া পরিচয় দেয়া ও জাল দলিল করা।

(১) যদি কোনো ব্যক্তি কোনো নিষিদ্ধ স্থানে প্রবেশ লাভের উদ্দেশ্যে, কিংবা অন্য কোনো ব্যক্তিকে কোনো নিষিদ্ধ স্থানে প্রবেশে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে, কিংবা রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য ক্ষতিকর অন্য কোনো উদ্দেশ্যে–

(ক) বৈধ কর্তৃত্ব বা অনুমোদন ব্যতীত নৌ, সেনা, বিমান বাহিনী, পুলিশ বা অন্য কোনো সরাকারী উর্দি কিংবা এগুলোর প্রায় অনুরূপ উর্দি ব্যবহার করে যাতে তাকে দেখতে এ ধরনের উর্দি ব্যবহার বা পরিধানের অনুমোদিত ব্যক্তি বলে মনে হয়; কিংবা

(খ) মৌখিক বা লিখিতভাবে কোনো ঘোষণা বা আবেদনপত্রের বা নিজে অথবা তার পক্ষে স্বাক্ষরিত কোনো দলিলে, স্বজ্ঞানে কোনো মিথ্যাচার করেন বা তাতে সহায়তা করেন বা কোনো তথ্য গোপন করেন; কিংবা

(গ) কোনো পাসপোর্ট কিংবা, কিংবা নৌ সেনা ও বিমান বাহিনীর বা সরকারী ছাড়পত্র, অনুমতিপত্র, সার্টিফিকেট, লাইসেন্স বা অনুরূপ বৈশিষ্ট্যের অন্য দলিল জাল, পরিবর্তন বা বদল করে, কিংবা জ্ঞাতসারে এই ধরনের কোনো জাল , পরিবর্তনকৃত বা বিধি বর্হিভূত সরকারী দলিল ব্যবহার করে বা নিজের হেফাজতে রাখে; কিংবা

(ঘ) নিজের ভুয়া পরিচয় দেয়, কিংবা সরকারের অধীনে কোন পদে নিয়োজিত ব্যক্তি বলে নিজেকে অবৈধভাবে উপস্থাপন করে, কিংবা যে ব্যক্তিকে বৈধভাবে কোনো সরকারি নথিপত্র বা গোপন সরকারি সংকেত শব্দ প্রদান জ্ঞাত করা হয়েছে, সেই ব্যক্তি বলে নিজেকে পরিচিত করে, কিংবা নিজের বা অন্য কারো জন্য সরকারি নথিপত্র, গোপন সরকারী সংকেত বা সংকেত শব্দ লাভের উদ্দেশ্যে জ্ঞাতসারে কোনো মিথ্যা বিবৃতি দেয়; কিংবা

(ঙ) সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতীত সরকারের কোনো বিভাগ, কিংবা সরকারের কোনো কূটনৈতিক, নৌ, সেনা বা বিমানবাহিনী কর্তৃপক্ষের অধিকারভূক্ত, ব্যবহৃত, তৈরি বা সরবরাহকৃত কোনো ছাঁচ, সিলমোহর, স্ট্যাম্প কিংবা প্রায়-অনুরূপ কোনো ছাঁচ, সিলমোহর বা স্ট্যাম্প ব্যবহার করে, বা তার নিজের কাছে বা তার নিয়ন্ত্রণে রাখে যাতে এ ধরনের কোনো জাল ছাঁচ, সিলমোহর বা স্ট্যাম্প ব্যবহার করে কিংবা নিজের কাছে বা তার নিয়ন্ত্রণে রাখে; তাহলে সে এই ধারায় অপরাধী সাব্যস্ত হবে।

(২) যদি কোনো ব্যক্তি রাষ্ট্রের নিরাপত্তার পক্ষে ক্ষতিকর কোনো উদ্দেশ্যে –

(ক) কোনো সরকারী দলিল নিজের কাছে রাখে, তা সম্পূর্ণ হোক বা না হোক যখন তা রাখার কোনো অধিকার তার নেই, কিংবা তা রাখা তার দায়িত্বের পরিপন্থি, কিংবা এই দলিল ফেরত দেয়া বা রূপান্তর করার ব্যাপরে সরকারের কোনো বিভাগ কিংবা এই ধরনের বিভাগের অনুমোদিত কোনো ব্যক্তির জারিকৃত কোনো নির্দেশ মেনে চলতে ইচ্ছাকৃভাবে ব্যর্থ হয়; কিংবা

(খ) কেবল তার নিজের ব্যবহারে জন্য ইস্যুকৃত কোনো সরকারী দলিল অন্য কোনো ব্যক্তির কাছে রাখতে দেয়, কিংবা ইস্যুকৃত কোনো গোপন সরকারী সংকেত বা সংকেত শব্দ অন্য কাউকে সরবরাহ করে, কিংবা বৈধ অনুমোদন বা ওজর ব্যতীত অন্য কোনো ব্যবহারের জন্য ইস্যুকৃত কোনো সরকারী দলিল বা গোপন সরকারী সংকেত বা সংকেত শব্দ তার কাছে রাখে, কিংবা কোথাও দেখতে পেয়ে বা অন্য কোনভাবে কোনো সরকারী দলিল তার হাতে এলে তার ইস্যুকারী বা যার ব্যবহারে জন্য ইস্যু করা হয়েছিল তার বা তাদের কাছে, কিংবা কোনো পুলিশ কর্মকর্তার কাছে ফেরত দিতে ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যর্থ হয়; কিংবা

(গ) বৈধ অনুমোদন বা ওজর ব্যতীত উপরোল্লিখিত ধরনের কোনো ছাঁচ, সীলমোহর বা স্ট্যাম্প তৈরি করে বা বিক্রি করে কিংবা বিক্রির জন্য নিজের কাছে রাখে; সে এই ধারার অধীনে অপরাধ সংঘটনের জন্য দোষী হবে।

(৩) এই ধারার অধীনে কোনো অপরাধের জন্য দোষী ব্যক্তি ২ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড, কিংবা জরিমানা, কিংবা উভয় প্রকার শাস্তি যোগ্য।

(৪) রাষ্ট্রের নিরাপত্তার প্রতি ক্ষতিকর কোনো উদ্দেশ্য প্রমাণের জন্য এই ধারার অধীনে কোনো অপরাধের বিচারে, কিংবা অনুরূপ উপায়ে গোপন সরকারী সংকেতের ক্ষেত্রে, তা যেভাবেই প্রযোজ্য হয়, রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বা স্বার্থের প্রতি ক্ষতিকর কোনো উদ্দেশ্য বা কর্ম প্রমাণের জন্য এই ধারার অধীনে বিচারে ১৪ বছর পর্যন্ত শাস্তিযোগ্য অপরাধের বিচারের ক্ষেত্রে ধারা ৩-এর উপধারা (২)-এর বিধান প্রযোজ্য হবে।

৭. পুলিশ বাহিনীর কর্মকর্তা কিংবা বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনীর সদস্যদের কাজে হস্তক্ষেপ।

(১) কোনো ব্যক্তি নিষিদ্ধ বা সংরক্ষিত স্থানের কাছে নিষিদ্ধ স্থানের প্রহরা বা টহলদানের কাজে বা অনুরূপ অন্য কোন দায়িত্বে নিয়োজিত কোনো পুলিশ কর্মকর্তা বা বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনীর কোনো সদস্যের কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি, জ্ঞাতসারে বিভ্রান্ত কিংবা অন্য কোনোভাবে হস্তক্ষেপ করতে বা বাধা দিতে পারবে না।

(২) কোনো ব্যক্তি এই ধারার বিধান লঙ্ঘন করলে তার সর্বোচ্চ ২ বছর কারাদণ্ড বা জরিমানা বা উভয় দণ্ড হতে পারে।

৮. অপরাধ সংঘটন সম্পর্কে তথ্য প্রদানের দায়িত্ব

(১) প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য হবে ধারা ৩, বা ধারা ৯-এর সাথে পঠিত ধারা ৩-এর অধীনে সংঘটিত কোনো অপরাধ বা সন্দেহজনক অপরাধ সম্পর্কে একজন সুপারিটেন্ডেন্ট অফ পুলিশ কিংবা পুলিশ মহা পরিদর্শকের নিকট থেকে বা ঢাকা মহানগরী এলাকায় তার পক্ষে পুলিশ কমিশনারের নিকট থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্যূন পরিদর্শক পদমর্যাদার অন্য কোনো পুলিশ কর্মকর্তা, কিংবা প্রহরা, টহল বা অনুরূপ দায়িত্বে নিয়োজিত বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর কোনো সদস্যের কাছে তার সাধ্যমত তথ্যপ্রদান করা, এবং প্রয়োজন হলে এই ধরনের তথ্য দেয়ার জন্য যথাযথ সময়ে ও স্থানে তার যুক্তিসঙ্গত খরচ বহনের মাধ্যমে হাজির হতে বলা হবে।

(২) কোনো ব্যক্তি এই ধরনের কোনো তথ্য দিতে কিংবা উল্লিখিত সময় বা স্থানে হাজির হতে ব্যর্থ হলে তার সর্বোচ্চ ২ বছর কারাদণ্ড বা জরিমান কিংবা উভয় দণ্ড হতে পারে।

৯. উত্তেজনা সৃষ্টির প্রচেষ্টা ইত্যাদি

যে ব্যক্তি এই আইনের অধীনে কোনো অপরাধ সংঘটনের চেষ্টা করবে, কিংবা সে কাজে সাহায্য করবে, তারও অনুরূপ শাস্তি হবে এবং তার বিরুদ্ধে বিচারকার্য এভাবে চলবে যেন সে নিজেই এই ধরনের অপরাধ করেছে।

১০. গুপ্তচরদের আশ্রয়দানের দণ্ড

(১) যদি কোনো ব্যক্তি জ্ঞাতসারে অন্য এমন কোন ব্যক্তিকে আশ্রয় দান করে যাকে সে চেনে, কিংবা যাকে এমন ব্যক্তি বলে মনে করার যুক্তিসঙ্গত কারণ তার রয়েছে যে ধারা ৩ কিংবা ৯-এর সাথে পঠিত ধারা

৩-এর অধীনে কোনো ব্যক্তিকে তার নিজের দখলীয় বা নিয়ন্ত্রণাধীন কোনো স্থানে সাক্ষাৎ করতে বা সমবেত হবার অনুমতি দেয়, তাহলে সে এই ধারার অধীনে অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত হবে।

(২) যেসব ব্যক্তি উপরোল্লিখিত ধরনের কোনো ব্যক্তিকে আশ্রয় দিয়েছে কিংবা তার দখলাধীন বা নিয়ন্ত্রণাধীন কোন স্থানে সাক্ষাৎ করতে বা সমবেত হতে অনুমতি দিয়েছে, তাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব হবে চাওয়ামাত্র কোনো সুপারিটেন্ডেন্ট অফ পুলিশ, কিংবা পুলিশের মহাপরিদর্শক বা ঢাকা মহানগরী এলাকায় পুলিশ কমিশনারের নিকট থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্যূন পরিদর্শক পদমর্যাদার অন্য কোনো পুলিশ কর্মকর্তার কাছে এই ধরনের ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমূহ সম্পর্কে সাধ্যমত তথ্যপ্রদান করা। কোনো ব্যক্তি এই ধরনের তথ্য দিতে ব্যর্থ হলে সে এই ধারার অধীনে দোষী হবে।

(৩) এই ধারার অধীনে দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তির সর্বোচ্চ এক বছর কারাদণ্ড, কিংবা জরিমানা কিংবা উভয় দণ্ড হতে পারে।

১১. তল্লাশি পরওয়ানা।

(১) যদি কোনো প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট বা মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট হলফের মাধ্যমে প্রদত্ত তথ্যের দ্বারা সন্তুষ্ট হন যে, এই আইনের অধীনে কোনো অপরাধ সংঘটিত হওয়ার উপক্রম বলে সন্দেহ করার যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে, তখন তিনি অন্যূন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তাকে তল্লাশি পরওয়ানার এমন ক্ষমতা প্রদান করতে পারেন যার ক্ষমতা বলে উক্ত কর্মকর্তা যে কোনো সময়ে পরওয়ানায় উল্লিখিত অঙ্গন বা স্থানে উপস্থিত করার প্রয়োজন হলে জোরপূর্বক প্রবেশ করতে পারবেন এবং এই অঙ্গন বা স্থানে উপস্থিত প্রত্যেককে তল্লাশি করতে এবং এই ধরনের লোকের অঙ্গনে বা স্থানে যে কোনো নকশা, প্ল্যান, মডেল, সামগ্রী, টীকা বা নথিপত্র কিংবা এ ধরনের অন্য কোন জিনিস বা এমন কিছু আটক করতে পারবেন যা এই আইনের অধীনে সংঘটিত বা সংঘটিত হওয়ার উপক্রম অপরাধের সাক্ষ্য প্রমাণ হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে, এবং এগুলো থেকে তার সন্দেহ করবার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে যে, এই আইনের একটি অপরাধ সংঘটিত হয়েছে কিংবা সংঘটিত হওয়ার উপক্রম হয়েছে।

(২) অন্যূন সুপারিনন্ডেন্ট পদমর্যাদার একজন পুলিশ কর্মকর্তার কাছে যখন প্রতীয়মান হয় যে, মামলাটি অত্যন্ত জরুরি গুরুত্বপূর্ণ এবং রাষ্ট্রের স্বার্থে অবিলম্বে ব্যবস্থাগ্রহণ প্রয়োজন, তাহলে তিনি অন্য কোনো পুলিশ কর্মকর্তাকে নিজ হাতে লিখিতভাবে অনুরূপ ক্ষমতা দিতে পারেন, যেমনটি এ ধারার অধীনে একজন ম্যাজিস্ট্রেটের পরওয়ানা দেয়া যেতে পারে।

(৩) উপধারা (২)-এর অধীনে কোনো পুলিশ কর্মকর্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করলে তিনি যত শীঘ্র সম্ভব এই ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কে জেলা বা মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটকে অবহিত করবেন।

১২. গ্রেফতারের ক্ষমতা

১৮৯৮ সালের ফৌজদারি কার্যবিধিতে অন্যরকম যাই থাকুক না কেন –

(খ) এই আইনের অধীনে ১৪ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের বিধান সম্বলিত অপরাধ ব্যতীত অন্য কোনো অপরাধ আদালতে মামলাযোগ্য এবং জরিমানাযোগ্য অপরাধ বলে বিবেচিত হবে; এবং

(গ) বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর যে কোনো সদস্য ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশ ও কোনো পরওয়ানা ছাড়াই কোনো নিষিদ্ধস্থানের ভেতরে বা কাছে এমন যে কোনো ব্যক্তিকে গ্রেফতার করতে পারবেন, যে ব্যক্তি ধারা ৩

কিংবা ধারা ৯-এর সাথে পঠিত ধারা ৩, কিংবা ধারা ৫-এর উপধারা (১) এর দফা (ক) বা (খ), কিংবা ধারা ৬-এর উপধারা (১)-এর দফা (ক) অধীনে কোনো অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্ট, কিংবা যার বিরুদ্ধে কোনো যুক্তিসঙ্গত অভিযোগ করা হয়েছে বা বিশ্বাযোগ্য তথ্য পাওয়া গেছে; বা সে এই রকম অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্ট রয়েছে বলে যুক্তিসঙ্গত সন্দেহ বিদ্যমান রয়েছে তবে অযথা বিলম্ব না করে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে এই মামলার এখতিয়ার সম্পন্ন কোনো ম্যাজিস্ট্রেট বা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে নিয়ে যাবেন অথবা পাঠাবেন এবং অতঃপর তৎকারণে পরওয়ানা ছাড়া গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি ম্যাজস্ট্রেট বা থানার কর্মকর্তার কাছে নেয়া বা পাঠানো কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধির বিধানসমূহ তার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

১৩. অপরাধের বিচার সংক্রান্ত বিধি নিষেধ

(১) সরকার কর্তৃক এই ব্যাপারে বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রথম শ্রেণীর আদালত ব্যতীত অন্য কোনো আদালত যা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত হতে নিম্নতর, তা এই আইনের অধীনে কোনো অপরাধের বিচার করতে পারবে না।

(২) অভিযোগনামা তৈরির আগে যে কোনো সময়ে এই আইনের অধীনে কোনো অপরাধের জন্য কোনো ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে বিচারাধীন কোনো ব্যক্তি দায়রা আদালত কর্তৃক তার বিচার অনুষ্ঠানের দাবি করতে পারবে সেক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেট অভিযুক্তকে অব্যাহতি না দিয়ে থাকলে মামলাটি সেই আদালতে পাঠাবেন যদিও মামলাটি শুধুমাত্র উক্ত আদালতের একান্ত এখতিয়ারভূক্ত নয়।

(৩) সরকার কিংবা এই ব্যাপারে সরকার প্রদত্ত ক্ষমতা বলে কোনো কর্মকর্তা অভিযোগ দায়ের না করলে কোনো আদালত এই আইনের অধীনে কোনো অপরাধের মামলা আমলে নিবেন না, যদি সরকার কিংবা এই ব্যাপারে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা সরকারের পক্ষে অভিযোগ দাখিল না করেন। এই অভিযোগ না করা হয়ে থাকলেও এই ধরনের অপরাধের জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা যেতে পারে, কিংবা তাকে গ্রেফতারের জন্য গ্রেফতারি পরওয়ানা জারি ও কার্যকর করা যেতে পারে এবং এই ধরনের কোনো ব্যক্তিকে পুলিশ হেফাজতে কিংবা জামিনে দেয়া যেতে পারে; তবে অভিযোগ না করা পর্যন্ত মামলার জন্য পরবর্তী বা অন্য কোনো কার্যধারা গ্রহণ করা যাবে না।

ধারা (৪) এই আইনের অধীনে কোনো অপরাধের জন্য কোনো ব্যক্তি বিচারের জন্যে অপরাধটি যেস্থানে সংঘটিত হয়েছে, কিংবা বাংলাদেশের অন্য কোনো স্থানে যেখানে অপরাধীকে দেখতে পাওয়া যায়, সেই স্থানে সংঘটিত হয়েছে বলে মনে করা যেতে পারে।

(৬) সরকার উপযুক্ত বিবেচনা করলে সাধারণ বা বিশেষ আদেশের মাধ্যমে নির্দেশ দিতে পারেন যে, ধারা ৩ বা ধারা ৯ এর সাথে পঠিত ধারা ৩ , কিংবা ধারা ৫ এর উপধারা (১) এর দফা (ক) ও (খ) কিংবা ধারা ধারা ৬ এর উপধারা (ক) এর অধীনে কোনো অপরাধের বিচারের পদ্ধতি হবে ১৯৪৩ সালের শত্রু এজেন্ট অধ্যাদেশ কিংবা বাংলাদেশ ফৌজদারি বিধি সংশোধনী আইন, ১৯৫৮, ১৯৫৮ সালের ৪০ নং আইন এর অধীনে সংঘটিত অপরাধের পদ্ধতির অনুরূপ।

১৪. বিচারকার্যে জনসাধারণের অনুপস্থিতি

কোন আদালতে কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে এই আইনের অধীনে কোন অপরাধের জন্য বিচারকার্য চলাকালে, বা আপিলের ওপর বিচারকার্য চলাকালে, কিংবা এই আইনের অধীনে কোনো লোকের বিচার চলাকালে বাদীপক্ষ যদি এই কারণ দেখিয়ে আবেদন জানান যে, বিচার চলাকালে যেসব সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপিত হবে বা যেসব বিবৃতি দেয়া হবে, তার কোনোটি প্রকাশ হয়ে গেলে রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য ক্ষতিকর হবে, তাহলে আদালত ক্ষমতার অতিরিক্ত এবং ক্ষমতা হানি না ঘটিয়ে যে কোনো বিচারকার্য চলাকালে জনসাধারনের উপস্থিতি নিষিদ্ধ করে এই মর্মে আদেশ দিতে পারেন যে, আদালতের শুনানির কোনো অংশ চলাকালে সমগ্র জনসাধারণ বা তাদের কোনো অংশকে আদালতে উপস্থিত থাকা থেকে বাদ দেওয়া হবে। তবে যে কোনো মামলার বিচারের রায় প্রকাশ্যে জনসমক্ষে হতে হবে।

১৫. কোম্পানিসমূহ ইত্যাদির সংঘটিত অপরাধ

এই আইনের অধীনে যখন দোষীপক্ষ কোনো কোম্পানি বা কর্পোরেশন হবে, তখন কোম্পানি বা কর্পোরেশনের যেসব পরিচালক ও কর্মকর্তার জ্ঞাতসারে বা সম্মতিক্রমে অপরাধটি সংঘটিত হয়, তারাও প্রত্যেকে অনুরূপ অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হবেন।

অবাধ তথ্য প্রবাহের যুগে আইনটি কী অচল

আজকের যুগ তথ্যের অবাধ স্বাধীনতার যুগ। রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকর্ম সরকারের গোপন এখতিয়ারে রাখার পুরনো ধারণা আজ অচল। আজকের জটিল রাষ্ট্রকাঠামো একজন নাগরিককে দেশের শাসন প্রক্রিয়ায় অধিকতর অংশগ্রহণ ও দায়িত্বের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। পরিবর্তিত গণমাধ্যম পরিস্থিতিতে তথ্যে প্রবেশের অধিকারকে সারা বিশ্বে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হচ্ছে।

ভুলে গেলে চলবে না যে, গণতান্ত্রিক দেশের সরকারী, আধাসরকারী, স্বায়ত্বশাসিত কিংবা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকান্ড কখনোই সমালোচনার উর্ধ্বে থাকতে পারে না। প্রতিষ্ঠানের দুর্বলতা কিংবা ত্রুটি-বিচ্যুতি জনগণের কাছে প্রকাশ হওয়া দরকার। সেকারণে আধুনিক রাষ্ট্রে সংবাদ সংগ্রহের স্বার্থে তথ্যপ্রাপ্তির সুযোগকে একটি অধিকার হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু দাপ্তরিক গোপনীয়তা আইনের ধারা পাঁচসহ কয়েকটি ধারা এই অধিকার খর্ব করে।

দাপ্তরিক গোপনীয়তা আইনে সরকারী তথ্য গোপন রাখার সংজ্ঞায়ন ও ধারণাটি খুবই বিস্তৃত ও অস্পষ্ট। ফলে সরকারী যেকোনো তথ্যই এই সংজ্ঞার আওতায় গোপনীয় বলে বিবেচিত হবে। কোনো সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞার অভাবে এই আইনটি সরকারকে একতরফা সুযোগ দিয়েছে নিজের সুবিধামতো কোনটি গোপনীয় আর কোনটি নয় তা নির্ধারণের[১১]।

রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার প্রশ্নেও দাপ্তরিক গোপনীয়তা আইন এর যৌক্তিকতা হারিয়েছে বলে ধারণা করা যায়। আধুনিক প্রযুক্তির কল্যাণে ইন্টারনেট, স্যাটেলাইট ও টেলিযোগাযোগের যে বিস্ময়কর উন্নতি হয়েছে তার ফলে পৃথিবী পরিণত হয়েছে একটি গ্রামে। এখানে এক মাধমে তথ্য আটকে গেলে অন্য মাধ্যমে তা ঠিকই বেড়িয়ে যায়। সুতরাং শুধুমাত্র দাপ্তরিক গোপনীয়তা আইন প্রয়োগের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়।

---

[১১] রোবায়েত ফেরদৌস ও মীর মোসারেফ হোসেন (২০০২), *প্রান্তজন*, সংখ্যা-২, এমএমসি, ঢাকা, পৃ. ১৩।

বাংলাদেশের সংবিধানের কয়েকটি অনুচ্ছেদের সাথে এই আইন দ্বন্দ্ব-সংঘাতে লিপ্ত হয়। সংধিানের ৭ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী দেশের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ। সকল সরকারী কাজকর্ম জনগণের জন্য এবং এসব কাজকর্ম জনগণের অর্থে পরিচালিত হয়। যখন সরকারী অফিসে কোনো নাগরিক তথ্য জানতে চান, তখন সরকারী গোপন তথ্যের অজুহাতে, তাদের ফিরিয়ে দেয়া হয়।

সংবিধানের ৩২ অনুচ্ছেদের মাধ্যমে জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার সংরক্ষণ করা হয়েছে। অর্থাৎ জীবনকে রক্ষা করতে এবং মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপন করতে যা কিছু প্রয়োজন সে সব কিছুর অধিকার আমাদের আছে। কিন্তু ব্রিটিশ আমলের এই দাপ্তরিক গোপনীয়তা আইনের বলে আমাদের জীবনকে প্রভাবিত করে এমন অনেক বিষয় নাগরিক হিসেবে আমরা জানতে পারি না।

আজকের সময়ে প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার কথা সব সময় বলা হয়। প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা না থাকলে দুর্নীতি বাড়ে। স্বচ্ছ ও জবাবদিহি প্রশাসন গড়তে হলে তথ্য গোপন করে নয় বরং তথ্যে প্রবেশের দ্বার উন্মুক্ত করেই সম্ভব। কারণ গোপনীয়তার সংস্কৃতি স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার বিপরীত মেরুতে অবস্থান করে। তাই এখানে প্রয়োজন প্রশাসনে তথ্যগত স্বচ্ছতা[১২]। প্রশাসনিক কার্যক্রম সম্পর্কে জনগণের সম্যক ধারণা থাকলে, প্রশাসনিক কাজকর্ম সম্পর্কে তথ্য পেলে জনগণ উন্নত, সমৃদ্ধ, বিকশিত ও পরিতৃপ্ত জীবনযাপনের সুযোগ পায়।

জাতীয় উন্নয়নের ক্ষেত্রেও এটা এক ধরণের বাধা। কেননা উন্নয়নের জন্য সমাজের সর্বস্তরের তথ্য নিশ্চিত করা অপরিহার্য। বলা হয়ে থাকে তথ্য প্রযুক্তি যে দেশে জণগন যত বেশি পেয়ে থাকে সে দেশের উন্নতির মাত্রা তত বেশি। তথ্য জানার অধিকার নিয়ে সারা দুনিয়ায় এখন ব্যাপক ক্যাম্পেইন হচ্ছে । এই আইন থাকলে নাগরিকদের কাছে সরকারের সব সময় একটা স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা থাকে এটা সত্যি ।

আদালতের আচরণে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা অন্যদের চেয়ে বেশি । কারণ দুই পক্ষের মধ্যে জেরা হয় এবং রায় পড়ে শোনান উন্মুক্ত আদালতেই।

দাপ্তরিক গোপনীয়তা আইন প্রণয়ন করা হয়েছে আজ থেকে ৮০ বছর আগে। তখন শাসন ব্যবস্থার সংঘাত ছিলো। পরাধীন ওই সময়ে এক দল শাসক ছিলো, অন্য দল ছিলো শাসিত । আগের অবস্থা আর এখনকার অবস্থার মধ্যে আকাশ পাতাল ফারাক। বর্তমানে জনকল্যাণকর সরকার প্রতিষ্ঠিত। ফলে এখন আর পরাধীন দেশের দাপ্তরিক গোপনীয়তা আইন দরকার নেই । তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিধি নিষেধ থাকতে পারে। যেমন আইন শৃংখলার তদন্তাধীন রয়েছে এমন বিষয়ে গোপনীয়তা থাকতে পারে। কিন্তু উন্নয়ন সম্পর্কিত কোনো বিষয়ের গোপনীয়তা থাকতে পারে না।

দুনিয়া আজ অনেক বদলে গেছে। এখন সামরিক অনেক বিষয়ও গোপন রাখার উপায় নেই। কারণ বাংলাদেশ সামরিক কোনো সরঞ্জামাদি তৈরি করতে পারে না। তারা ইচ্ছা করলেই চীনের কাছ থেকে অস্ত্র ক্রয় করতে পারে না। জাতিসংঘের অস্ত্র বিষয়ক একটি কমিটি আছে যেখানে কোনো দেশ অস্ত্র ক্রয় করতে চাইলে আগে থেকেই তাকে রেজিষ্ট্রি করতে হবে। সুতরাং সামরিক তথ্য আজ আর গোপন থাকছে না। এমনকি ইচ্ছা করলেও গোপন রাখা যায় না। জাতিসংঘ যে তথ্য জানতে পারে দেশের নাগরিক হিসেবে

---

[১২] মুসতাক আহমেদ (২০০৭), *গণমাধ্যমের রাজনৈতিক অর্থনীতি*, এএইচডিপিএইচ, ঢাকা, পৃ. ১৭৯।

সাধারণ নাগরিকও সেটি জানার অধিকার রাখে। কিন্তু দাপ্তরিক গোপনীয়তা আইন তা জানতে আমাদের বাধা দেয়।

তথ্য জানা মানুষের জন্মগত অধিকার কিন্তু তা কখনো রাষ্ট্রের স্বার্থের কথা বলে, কখনো ব্যবসায়িক স্বার্থের অজুহাতে সরবারহ করা হয় না।

সাংবাদিকরাও তথ্য পাওয়ার অধিকার রাখেন। সেটা না পাওয়ার ফলে তাদের প্রতিবেদন অসম্পূর্ণ থেকে যায়। বিশেষ করে দুর্নীতির কোনো রিপোর্ট প্রকাশ হলে এ সমস্যা বেশি হয়। দেখা যায় রিপোর্টটি প্রামাণ্য দলিল হিসেবে তা ক্রেডিবিলিটি হারিয়ে ফেলে বা মিস রিপোর্টিং হয়ে যায়। এতে করে সাংবাদিকরাই ভোগান্তির শিকার হন বেশি ।

যেসব তথ্য জানা সাধারণ মানুষের জন্য ভালো সেগুলোও তারা জানে না। যেমন স্বাস্থ্য বিষয়ে কোথায় গেলে সুবিধা পাওয়া যাবে তাও অনেকে জানেন না ফলে স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত হন।

উপরের আলোচনা থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়েছে যে, মানুষের স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকার জন্য তথ্য জানার অধিকার অপরিহার্য। আজকের বিশ্বে তথ্য জানার অধিকারকে মানবাধিকার হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। বিভিন্ন দেশ, আর্ন্তজাতিক বিভিন্ন সংস্থা তথ্য-অধিকারের বিষয়টি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে যা নিচের আলোচনা থেকে স্পষ্ট হবে। অথচ বাংলাদেশ বৃটিশ আমালের একটি আইনের মাধ্যমে তথ্য জানার অধিকারকে খর্ব করছে গত আশি বছর ধরে।

উন্নয়ন ও দাপ্তরিক গোপনীয়তা আইন

উন্নয়ন তত্ত্ববিদ ও গবেবষকগণ উন্নয়নকে নানা দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাখ্যা করেছেন। দার্শনিক ইবনে খলদুন (১৩২২–১৪০৬) তাঁর *মুকাদ্দিমাহ* নামক বইয়ে সর্বপ্রথম উন্নয়ন শব্দটি ব্যবহার করেন। তিনি উন্নয়নকে দেখেছিলেন অর্থনেতিক ও সামাজিক অবকাঠামোর ইতিবাচক পরিবর্তন হিসেবে। তবে নানাবিধ দৃষ্টিকোণ থেকে উন্নয়নের নানান সংজ্ঞা রয়েছে।

কার্ল মার্কসের মতে 'ব্যক্তির উপর পরিস্থিতি ও দৈবের আধিপত্যের জায়গায় পরিস্থিতি ও দৈবের উপর ব্যক্তির আধিপত্য প্রতিস্থাপনকে' উন্নয়ন বলে।

লেহম্যান তার *ডেভেলপমেন্ট থিওরি* বইয়ে বলেছেন, 'সংজ্ঞাগত দিক থেকে উন্নয়ন হচ্ছে কোনো সমাজ, অর্থনীতি, নীতি বা সংস্কৃতিতে পরিবর্তন প্রক্রিয়া এবং পরিবার, শহর, গ্রাম, শিক্ষা, সামরিক বাহিনী ইত্যাদির প্রতি পরিবর্তনও বটে'।

মাইকেল টোডারো *ইকোনোমিক ডেভেলপমেন্ট ইন দ্য থার্ড ওয়ার্ল্ড* বইয়ে বলেন, 'উন্নয়নকে উচিত ... বিবেচনা করা বহুমাত্রিক প্রক্রিয়া হিসেবে যাতে সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার পুনর্গঠন ও পুন:অভিমুখীকরণ জড়িত'।

গত ৫০ বছরে উন্নয়ন বিষয়ক চিন্তা-ভাবনার দুটি প্রধান ধারা আমরা লক্ষ করি। এর একটি হচ্ছে ভোগবাদী ধারা অন্যটি উদারনৈতিক ধারা। ভোগবাদী দর্শন অনুযায়ী ভোগ্যসামগ্রীর প্রবাহ বৃদ্ধি, আয় বৃদ্ধিই হলো উন্নয়ন। ভোগ্যসামগ্রীর সরবরাহ ক্রমাগত বৃদ্ধির জন্য মোট জাতীয় উৎপাদনের ক্রমাগত বৃদ্ধি হলেই উন্নয়ন হচ্ছে বলে ধরতে হবে। উন্নয়ন ও আয়বৃদ্ধি সমার্থক। উদারনৈতিক দর্শন অনুযায়ী আয়বৃদ্ধির সাথে উন্নয়ন থেকে কারা লাভবান হচ্ছে সে প্রশ্নটিও গুরুত্বপূর্ণ। উন্নয়নের ভাগীদার যাতে সবাই হতে পারে আয়ের

পুনর্বণ্টনের ব্যাপারটির দিকে তাই নজর দেয়া হয়। তা না-হলে ধনী-দরিদ্রের পার্থক্য ও দারিদ্র্যের সমস্যা বেড়ে যাবে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে উন্নয়নকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা হয়। জীবনযাত্রার মানবৃদ্ধিকে উন্নয়নের লক্ষ্য বলে ধরে নেয়া হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গিও দুটি ধারায় বিভক্ত। একটিতে জোর দেয়া হয় পশ্চিমা উদার গণতন্ত্রের মডেল অনুযায়ী ব্যক্তির অধিকার উন্নয়নের উপর। ব্যক্তি মালিকানার স্বাধীনতা, বিনিময়ের স্বাধীনতা, আয়-ব্যয়-ভোগের স্বাধীনতা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা অর্জনকে উন্নয়নের সূচক বলে ধরা হয়। এর বিপরীতে সামাজিক দায়িত্ব ধারণা অনুযায়ী সামাজিক স্বার্থরক্ষা ও সংখ্যাগরিষ্ঠের সামাজিক অগ্রগতিকে উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু বলে ধরা হয়।

উন্নয়নের এই অধিকতর 'মানবিক' ধারার অগ্রপথিকদের একজন ডাডলি সিয়ার্স উন্নয়নকে 'মানব ব্যক্তিত্বের সম্ভাবনার বিকাশ' হিসেবে চিহ্নিত করেন। তিনি বলেন দারিদ্র, বেকারত্ব ও অসমতা হ্রাস ও দূর করা গেলেই উন্নয়ন ঘটেছে বলা যাবে। বিপরীতক্রমে তিনি বলেন, 'এসব মূল সমস্যার একটি বা দুটি বিশেষত তিনটিই যদি ক্রমাগত খারাপের দিকে যায়, তবে মাথাপিছু আয় এমনকি দ্বিগুণ হয়ে গেলেও তাকে 'উন্নয়ন' বলে অভিহিত করা হবে অবাক কাণ্ড'। পরবর্তীতে তিনি তার উন্নয়ন-ধারণাকে আরো সম্প্রসারিত করে এতে স্বনির্ভরতা ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার মত ব্যাপারগুলোও যুক্ত করেন: 'এখন উন্নয়ন বলতে বুঝায় একটি বা একাধিক বৃহৎশক্তির উপর সাংস্কৃতিক নির্ভরতা হ্রাস করা অর্থাৎ বিদ্যালয়গুলোতে জাতীয় ভাষার ব্যবহার বাড়ানো, স্থানীয়ভাবে (বা প্রতিবেশী দেশগুলোতে) উৎপাদিত অনুষ্ঠানগুলোর জন্য টেলিভিশনে আরো বেশি সময় বরাদ্দ করা, নিজদেশে অর্জিত উচ্চতর ডিগ্রির অনুপাত বৃদ্ধি করা, ইত্যাদি'।

মাইকেল টোডারো উন্নয়নের তিনটি উদ্দেশ্য নির্ধারণ করেন: এক. খাদ্য আশ্রয় এবং স্বাস্থ্য পরিচর্যার মত 'জীবনরক্ষাকারী' সেবাগুলোর পরিমাণ এবং বিতরণপরিধি বাড়ানো; দুই. জীবনযাত্রার মান ও ব্যক্তির আত্মমর্যাদা বাড়ানো; এবং তিন. অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিকল্পগুলোর সম্প্রসারণ ও ভীতি হ্রাস করা।

জাতিসংঘ উন্নয়ন ও দারিদ্র পরিস্থিতি পরিমাপের জন্য কিছু সূচক তৈরি করেছে যেগুলো আন্তর্জাতিকভাবে বহুল স্বীকৃত। জাতিসংঘের মানবউন্নয়ন সূচক (এইচডিআই) প্রত্যাশিত আয়ু, শিক্ষাগ্রহণ হার এবং সমন্বিত প্রকৃত আয় মানব উন্নয়নের এই তিনটি মৌলিক মাত্রায় একটি দেশের গড় অর্জন পরিমাপ করে। জাতিসংঘের মানব দারিদ্র সূচক (এইচপিআই) অধিকারহীনতা পরিমাপ করে ৪০ বছরের আগে কত শতাংশ লোক মারা যাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে, অশিক্ষিত প্রাপ্তবয়স্ক জনগোষ্ঠীর শতকরা হার, স্বাস্থ্য সেবা ও নিরাপদ পানির সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর শতকরা হার এবং পাঁচ বছরের কম বয়স্ক স্বল্প ওজনী শিশুর শতকরা হারের ভিত্তিতে।

অমর্ত্য সেনের মতে উন্নয়নের অত্যন্ত প্রাথমিক ও সার্বজনীন লক্ষ্য হচ্ছে ১) ক্ষুধা থেকে মুক্তি; ২) দীর্ঘ আয়ু প্রত্যাশা; ৩) চিকিৎসা ও হাসপাতালে সেবা পাবার অধিকার; এবং ৪) ন্যূনতম শিক্ষা।

১৯৬২ সালে র‍্যাচেল কার্সনের *দ্য সাইলেন্ট স্প্রিং* বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে প্রবৃদ্ধিমুখী উন্নয়ন ধারণার সমস্যার দিকটি তুলে ধরা হয়। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির তাগিদ থেকে ডিডিটি'র মত ক্ষতিকর রাসায়নিক কীটনাশক হিসেবে ব্যবহার করা হয় কৃষিক্ষেত্রে। ফলে ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ-জীবাণুর সাথে মারা যায় উপকারী পোকা আর জীবাণুও। খাদ্যসঙ্কটে পড়ে কৃষিজমির আশেপাশের এলাকার পাখীরা। তাদের ডিমের খোসা

পাতলা হয়ে যায়, অসময়ে ডিম ফুটে বেরিয়ে বিকলাঙ্গ শাবক, স্বল্পমেয়াদী স্বার্থের কথা ভেবে নেয়া উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের দীর্ঘমেয়াদী অপপ্রভাবগুলোর ভাবনা থেকেই উঠে আসে টেকসই উন্নয়নের কথা।

টেকসই উন্নয়নের সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত সংজ্ঞাটি ব্রান্টল্যাণ্ড কমিশন (১৯৮৭) প্রদত্ত। কমিশনের মতে 'টেকসই (ধারনযোগ্য) উন্নয়ন হচ্ছে যে উন্নয়ন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চাহিদা মেটানোর ক্ষমতাকে ক্ষতিগ্রস্ত না-করে বর্তমানের চাহিদা মেটায়'। এই সংজ্ঞায় দুটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণার উল্লেখ রয়েছে। একটি হচ্ছে চাহিদার ধারণা, বিশেষত বিশ্বের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর চাহিদা, যার প্রতি সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া উচিত। অন্যটি হচ্ছে সীমাবদ্ধতার ধারণা, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চাহিদাগুলো পুরণে পরিবেশের সক্ষমতার উপর প্রযুক্তিগত অবস্থা ও সংগঠনগুলো যা আরোপ করে থাকে।

হোল্ড গেটের (১৯১৩) মতে, উন্নয়ন হচ্ছে সম্পদের সদ্ব্যবহার, পুনর্নবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদের ধারনযোগ্য উন্নয়ন মনে রাখতে বলে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সীমাবদ্ধতার কথা, যদিও প্রযুক্তির মাধ্যমে এসব সীমাবদ্ধতা সমন্বয় করা সম্ভব।

জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচির (১৯৯১) সংজ্ঞানুযায়ী টেকসই উন্নয়ন হচ্ছে পরিবেশগত ব্যবস্থার ধারণ ক্ষমতার মধ্যে থেকে মানবজীবনের মানোন্নয়ন করা।

আজকের যুগে উন্নয়নকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, ভোটাধিকার, নারীর ক্ষমতায়ন, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, আইন ও বিচারের স্বাধীনতা, গড় আয়ু, নাগরিক স্বাধীনতা, সুশাসন, সুকুমারবৃত্তির চর্চা, জনগণের সৃজনশীলতা সবকিছুকেই উন্নয়নের ভেতরে ভাবা হয়। উন্নয়নের এই বৃহৎ ক্যানভ্যাসকে সামনে রেখে উন্নয়ন তত্ত্বে তথ্য বা যোগাযোগের ভূমিকাকে পুনর্মূল্যায়ন করা হচ্ছে এবং উন্নয়নে তথ্যের ভূমিকাকে খুবই গুরুত্ব সহকারে সামনে নিয়ে আসা হচ্ছে[১৩]। সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে এ বিষয়ে তিনটি চিন্তাধারা বিদ্যমান। প্রথমত: ক্ল্যাসিক্যাল ও নয়া ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদদের মনে করেন, উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় তথ্য হলো অবকাঠামো যা অর্থনৈতিক অগ্রগতির পূর্বশর্ত। দ্বিতীয়তঃ অর্থনীতিবিদ নন এমন তাত্ত্বিকদের মতে, সামাজিক পরিবর্তন ও আধুনিকায়নের জন্য তথ্য অন্য অনেক বিষয়ের সাথে সমন্বিত করে বিবেচনা করা হয়। তৃতীয়তঃ সমাজ মনেবিজ্ঞানীদের মতে, সমাজ পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় যা গুরুত্বপূর্ণ তার সবটায় প্রাপ্ত তথ্যের কার্যকর ব্যবহার[১৪]। সুতরাং বলা যায়, বর্তমান যুগে তথ্যই শক্তি, সামগ্রিক উন্নয়নের ভিত্তি। কেবল তথ্যসমৃদ্ধ নাগরিকই পারে জাতীয় উন্নয়নে লক্ষযোগ্য অবদান রাখতে। দাপ্তরিক গোপনীয়তা আইনের মাধ্যমে তথ্য গোপন করে রাখলে তা সম্ভব নয়।

তথ্য গোপন করার প্রবণতা দুর্নীতি ও অস্বচ্ছতার জন্ম দেয়

গোপনীয়তা সকল ধরনের দুর্নীতি ও অস্বচ্ছতার জন্ম দেয়। গোপনীয়তা থাকলে কারো কাছে জবাবদিহিতার প্রশ্ন থাকে না। সরকারী কর্মকান্ডে জনগণের অংশগ্রহণ থাকে। সরকারী কর্মকাণ্ডে জনগণের অংশগ্রহণ, অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্রের মূল কথা। সরকারী, বেসরকারী সকল প্রতিষ্ঠানে দলিল, দস্তাবেজ, নথি গোপনে লুকিয়ে রাখার ব্যবস্থা আছে বলেই যে দুর্নীতি হচ্ছে। প্রশাসনিক তথ্য উন্মুক্তকরণের মাধ্যমে দুর্নীতিরোধ সম্ভব। তথ্যমাধ্যমে সেগুলো প্রকাশ পাওয়া প্রয়োজন। ১৯৯৯ সালে বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট জেমস ডি.

---

১৩ রোবায়েত ফেরদৌস ও মীর মোশারেফ হোসেন (২০০২), *প্রান্তজন*, সংখ্যা-২, এমএমসি, ঢাকা, পৃ. ১৬-১৭।

১৪ Uma Narula (1994), *Development Communication: Theory and Practice*, New Delhi, Haranand, p. 14.

উলফেনসন দুর্নীতি রোধে তথ্যের ভূমিকাকে ব্যাখ্যা করে বলেন, 'সুশাসন ও দুর্নীতিমুক্ত রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে তথ্যপ্রবাহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং দুর্নীতির বিস্তার রোধেও রাখে কার্যকরী ভূমিকা'[১৫]।

তথ্যমাধ্যমকে বলা হয় রাষ্ট্রের চতুর্থ শক্তি। বলা হয়ে থাকে যে সুশীল সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে গণতান্ত্রিক সমাজে তথ্যমাধ্যম সংসদ , সরকার ও বিচারব্যবস্থার পরপরই অবস্থান করে। তাই প্রত্যাশা করা যে জনস্বার্থ বিরোধী যেকোনো কার্যক্রম প্রতিরোধে তথ্যমাধ্যম কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে। বিশ্বব্যাংকের গর্ভন্যান্স, রেগুলেশন ও ফাইন্যান্স বিভাগের ব্যবস্থাপক ডানিয়েল কউফম্যান দুর্নীতি কীভাবে রোধ করা যায় তা একটি সমীকরণের সাহায্যে দেখিয়েছেন –

AC (Anti-Corruption Efforts) = KI (Knowledge and Information) +LE (Leadership) + CA (Collective Action)[16].

অর্থাৎ দুর্নীতি বিরোধী কার্যক্রম তখনই সফল হবে যখন যথাযথ তথ্য, উপযুক্ত নেতৃত্ব এবং ... প্রতিরোধী ব্যবস্থায় সমন্বয় কর্ম জোরদার করা সম্ভব। এক্ষেত্রেও লক্ষণীয় যে, দুর্নীতি প্রতিরোধে কউফম্যান এর ভাষার কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করছে তথ্য ও জ্ঞান।

একটি দুর্নীতিমুক্ত রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে তাই তথ্য ও তথ্যমাধ্যমের ভূমিকা অনস্বীকার্য। তথ্যমাধ্যম সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জনস্বার্থবিরোধী সিদ্ধান্ত ও দুর্নীতির খবর মানুষকে জানিয়ে দিতে পারে এবং অধিকার রক্ষায় মানুষকে সচেতন করতে পারে। জে. এম. ব্যালকিন মনে করেন, 'সরকারী কর্মকর্তা বা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যখন দুর্নীতিতে লিপ্ত হন অথবা জনগণের স্বার্থের প্রতিকূলে কোন সিদ্ধান্তগ্রহণ করেন তখন জনমত সংগঠিত করার মাধ্যমে তথ্যমাধ্যম তাদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে সম্ভাব্য দুর্নীতি প্রতিরোধে ভূমিকা রাখে'[১৭]।

তথ্যমাধ্যম নীতিভ্রষ্ট কর্মকর্তা কর্মচারীদের মুখোশ উন্মোচন করে জনসমক্ষে হাজির করতে পারে। ফলে জগগণ যেমন তাদের প্রত্যাখ্যান করবে তেমনি তথ্যমাধ্যমের যথাযথ ভূমিকার কারণে তাদেরকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো যাবে। এছাড়া তথ্যমাধ্যম দুর্নীতি বিরোধী প্রতিবেদন, অনুষ্ঠান ইত্যাদি প্রচার-প্রকাশের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে দুর্নীতি-বিরোধী মানসিকতা গড়ে তুলতে পারে। তথ্য গোপন রাখার বন্দোবস্ত করা হলে দুর্নীতি ও অস্বচ্ছতা বাড়বে, কমবে না।

তথ্য অধিকারের ব্যাপারে দক্ষিণ এশিয়ার দৃষ্টিভঙ্গি

দক্ষিণ এশিয়ার কোন দেশেই জাতীয় পর্যায়ে তথ্য স্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্য বাস্তব ও ব্যবহারিক কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় নি। এ অঞ্চলের বেশির ভাগ দেশেই সেই উপনিবেশ আমলের দাপ্তরিক গোপনীয়তা আইন আছে। সেগুলো তথ্য উন্মুক্তকরণ প্রক্রিয়াকে যথাসম্ভব দূর্বল করছে। ব্যক্তিগত সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য দক্ষিণ এশিয়ার সরকারী কর্মকর্তাগণ জনগণের কল্যাণ সাধনের পরিবর্তে তারা দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার ও অব্যবস্থাপনায় জড়িয়ে পড়ে। ফলে আইনের মাধ্যমে তথ্য স্বাধীনতা নিশ্চিত করার প্রয়োজন পড়ে।

---

১৫ Jems D. Wolfenson, Bank Fund Annual...speech, 1999.

১৬ Daniel Kaufmann, World Bank Staff Meeting, April, 1999.

১৭ J M Balkin, How Mass Media Simulate Political Transparency, P. 2.

দক্ষিণ এশিয়ার গণমাধ্যমগুলো অবাধ তথ্য প্রবাহের ক্ষেত্রে তেমন কোনো ভূমিকা পালন করছে না। দেশভেদে প্রচলিত আইনের কাঠামো ভিন্ন। কিন্তু প্রিন্ট মিডিয়ার লাইসেন্সিং প্রথা, অপরাধামূলক মানহানি আইনসহ বিভিন্ন প্রকার নিপীড়নমূলক আইনের মাধ্যমে দেশে দেশে প্রতিবাদী ও সমালোচনামূলক কণ্ঠস্বরকে থামিয়ে দেবার যে চেষ্টা দেখা যায়, তার ধারণা প্রায় অভিন্ন।

এ অবস্থার পরিবর্তন জরুরী হয়ে পড়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে দক্ষিণ এশিয়ার কিছু দেশের সর্বোচ্চ আদালত মানুষের মতামত প্রকাশ তথা চিন্তনের স্বাধীনতার সাংবিধানিক রক্ষাকবচ হিসেবে তথ্য প্রাপ্তির অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে। এ-অঞ্চলের দেশগুলোর সুশীল সমাজ ও তথ্য অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা দেখানো ও আইন পাসের জন্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে।

গণমাধ্যম এবং তথ্যের আর্ন্তজাতিক প্রবণতা অনুসন্ধানের অংশ হিসেবে দক্ষিণ এশিয়ার কয়েকটি দেশের ওপর আঞ্চলিক পর্যায়ে একধিক গবেষণা জরিপ পরিচালিত হয়। আঞ্চলিক এ-প্রজেক্টের অংশ হিসেবে চারটি সংগঠন দক্ষিণ এশিয়ায় 'তথ্য স্বাধীনতার অগ্রগতি' শিরোনামে একটি জরিপ পরিচালনা করে। জরিপ পরিচালনাকারী সংস্থাগুলো হচ্ছে লন্ডনভিত্তিক Global Campaign for Free Expression. কলম্বোভিত্তিক Center for Policy Alternatives, নয়াদিল্লিভিত্তিক Commonwealth Human Rights Commission.

ইতোমধ্যেই দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশগুলোর সরকার তথ্য জানার অধিকারের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখছে। ভারতের পার্লামেন্ট ২০০০ সালে 'Freedom of Information Act ' আইন পাশ করেছে । এরপর ভারতীয় কয়েকটি রাজ্যেও এ বিষয়ে উপযুক্ত আইন বা বিধি গ্রহণ করা হয়েছে । পাকিস্তানে ১৯৯৭ সালে ও ২০০০ সালে অনুরূপ একটি বিধান গৃহীত হলেও সেটি আইনে পরিণত হতে পারে নি।

এছাড়া নেপাল ও শ্রীলংকায় তথ্য অধিকারের বিষয়ে আইন প্রনয়নের জন্য কিছু সরকারী পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে। এই আইনগুলো বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন আছে এবং এই শীঘ্রই তথ্য স্বাধীনতা আইনে পরিণত হবে।

এছাড়া গবেষণাটি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, আর্ন্তজাতিক তথ্য অধিকারের স্বাধীনতা বিষয়ে সুনির্দিষ্ট ও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। এছাড়া জরিপে উপস্থাপিত সুপারিশ অনুসরণের মাধ্যমে তথ্য স্বাধীনতার আইনগত নিশ্চয়তার বিধান এবং জনগণের মধ্যে অবাধ তথ্যের প্রবাহ নিশ্চিত করা যেতে পারে।

সাংবিধানিক কাঠামোয় তথ্য জানার অধিকার: বিভিন্ন দেশের দৃষ্টিভঙ্গি

বিশ্বের কিছু কিছু দেশ তথ্য প্রাপ্তির অধিকার এবং তথ্য স্বাধীনতার ব্যাপারটিকে সাংবিধানিক পর্যায়ে স্বীকৃতি দিয়েছে। অনেক দেশেই তথ্য জানার অধিকারটিকে খুবই গুরুত্ব সহকারে দেখছে। এছাড়া কিছু কিছু দেশগুলোতে তথ্য জানার অধিকারের জন্য আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে–

নিম্নে এমন কিছু দেশের বর্ণনা দেয়া গেল:

যুক্তরাষ্ট্র

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তথ্যের অধিকারকে আইনে পরিণত করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের ফ্রিডম অফ ইনফরমেসন এ্যাক্ট-১৯৬৬ অনুযায়ী যে কোন নাগরিক সরকারী নথি ও কাগজপত্রের কাঙ্খিত প্রাপ্তির অধিকার রাখেন। এসকল তথ্য প্রাপ্তির পর যদি তা দশ দিনের মধ্যে সরবরাহ করা না হয় সেক্ষেত্রে ফেডারেল কোর্টে আবেদন পেশ করলে পরবর্তী কুড়ি দিনের মধ্যেই , সে তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার তার আছে কি নাই তা নির্ধারিত হবে।

বৃটেন ও কানাডা

বৃটেন ও কানাডায় তথ্য জানার অধিকারকে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে। বৃটেন আশির দশকে অ্যাকসেস টু ইনফরমেসন বিল উত্থাপিত হয় এবং আইনে পরিণত হয়। কানাডাও তাদের এ সংক্রান্ত আইনের নামকরন করেছে অ্যাকসেস টু ইনফরমেসন এ্যাক্ট।

আর্জেন্টিনা

লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশের সংবিধানে তথ্য অধিকারের দিকের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেবার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। সেটি হচ্ছে Habeas Data সম্পর্কিত আবেদন এবং সরকারী সংস্থার কাছ থেকে ব্যক্তির তথ্য পাবার অধিকার। উদাহরণ হিসেবে আমরা আর্জেন্টিনার সংবিধানের কথা বলতে পারি। এর ৪৩ নং ধারায় বলা হয়েছে-

'সরকারী- বেসরকারী তথ্যভাণ্ডার থেকে যে কোন প্রকার তথ্য দেখার জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিরই আবেদন করার অধিকার থাকবে[১৮]'।

পেরু

পেরুর সংবিধানে Habeas Data সম্পর্কিত বিধান রয়েছে। সেদেশের সংবিধনে Habeas Data শুধু নয়, তথ্য অধিকারের আরও অনেক সাধারণ নীতিমালা এতে অর্ন্তভূক্ত রয়েছে। এর ২০ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে-

'প্রত্যেক ব্যক্তি কোন কারণ ছাড়াই প্রয়োজনীয় তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করতে পারে। যেকোন সরাকারী প্রতিষ্ঠান থেকে যুক্তিসঙ্গত খরচে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সেই তথ্য পাবার অধিকার থাকবে[১৯]'।

জিম্বাবুয়ে

বর্তামান সময়ে জিম্বাবুয়ের সুপ্রীম কোর্ট একইরকম কয়েকটি ঘটনা নিয়ে বিতর্কের সূত্রপাত করেছে। ১৯৮০ সালের গোড়ার দিকে ঘটনা সম্পর্কে দুটি সরকারী তদন্তের ফলাফল প্রকাশ করতে সরকারকে আইনগতভাবে বাধ্য করার চেষ্টা করা হয়। সাম্প্রতিক সময়ে তথ্য জানার অধিকারের বিষয়টি সে দেশের সরকার গুরুত্ব সহকারে দেখছে।

সুইডেন

কিছু সংখ্যক দেশ তথ্য প্রাপ্তির অধিকারকে সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত মানবাধিকার এর আওতাভুক্ত করেছে। তথ্য স্বাধীনতা আইনের সবচেয়ে ভালো উদাহরণ হচ্ছে সুইডেন। দেশটিতে তথ্য স্বাধীনতার ব্যাপক ভিত্তিক বিধি বিধানকে সাংবিধানিক মর্যাদা দেয়া হয়েছে।

দক্ষিন আফ্রিকা

তথ্য প্রাপ্তির অধিকারের ক্ষেত্রে দক্ষিণ প্রজাতন্ত্রের সংবিধানই সম্ভবত সবচেয়ে অনন্য। তথ্য স্বাধীনতার নিশ্চয়তার পরিসরের জন্যই শুধু না, বরং এ কারণেও যে, তথ্য অধিকারের জন্য গৃহীত আইনগত পদক্ষেপ তিন বছরের মধ্যে কার্যকর করা হয় সেখানে। বর্তমান সময়ে তথ্য প্রাপ্তির অধিকারকে গুরুত্ব সহকারে দেখা হচ্ছে।

---

১৮ http://www.hri.ca

১৯ http://www.hri.ca

তথ্য জানার অধিকারের প্রবণতা: বিভিন্ন আর্ন্তজাতিক প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টিভঙ্গি

বর্তমান সময়ে বিভিন্ন দেশের অনুরূপ বিভিন্ন আর্ন্তজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোও তথ্য অধিকারের স্বীকৃতির জন্য অভূতপূর্ব পদক্ষেপ গ্রহণ করে যাচ্ছে। জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আর্ন্তজাতিক সংস্থাগুলো ক্রমাগত হারে জোরালো বিবৃতি দিয়ে তথ্য অধিকারের প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি অর্জনে ভূমিকা রাখছে। তথ্যের স্বাধীনতা শুধু নয়, তথ্য ব্যবহারের অধিকারের জন্য প্রয়োজনীয় ও কার্যকর আইন প্রনয়ণের ওপর গুরুত্বারোপ করছে।

জাতিসংঘ

১৯৪৬ সালে জাতিসংঘে তথ্য অধিকারের বিষয়টি স্বীকৃতি পায়। সাধারণ পরিষদের প্রথম অধিবেশনে ৫৯ (১) প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এতে বলা হয়-

'মানুষের অন্যতম মৌলিক অধিকার হলো তথ্যের স্বাধীনতা । এটি সকল প্রকার স্বাধীনতার পরশপাথর, তাকে জাতিসংঘ পবিত্রজ্ঞান করে[২০]'। আবার ১৯৪৮ সালের জাতিসংঘের মানবাধিকার সনদের ১৯-ধারায় বলা হয়েছে:

'প্রত্যেকেরই মতামতের ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা রয়েছে ; বিনা হস্তক্ষেপে মতামত পোষণ এবং যে কোন উপায়াদির মাধ্যমে ও রাষ্ট্রীয় সীমানা নির্বিশেষে তথ্য ও মতামত সন্ধান , গ্রহন ও জ্ঞাত করার স্বাধীনতা এই অধিকারের অর্ন্তভূক্ত'। এছাড়া ১৯৬৬ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ The International Covenant on Civil and political Rights (ICCPR) নামে আইনগত চুক্তি গ্রহণ করে। এই চুক্তিতেও একইভাবে কথা বলা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দেয়া হয়। ১৯৯৩ সালে জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশন মতামত প্রকাশ ও প্রকাশনার স্বাধীনতা রক্ষার প্রয়োজনে অফিস প্রতিষ্ঠা করে। ১৯৯৯ সালে জাতিসংঘ Special Rapport on Freedom of Opinion and Expression বিষয়ে একটি যৌথ ঘোষণাপত্র গ্রহণ করে। তারা উল্লেখ করে-

'মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা মানুষের মৌলিক অধিকার এর অর্থ হলো তথ্য প্রাপ্তির সুযোগ উন্মুক্তকরণ , জনগণের জন্য সরকার কী করছে তা জানার অধিকার । এই অধিকার ছাড়া সমাজে সত্য প্রতিষ্ঠিত হয় না এবং সরকারী কর্মকান্ডে জনগণের অংশগ্রহণ অসম্পূর্ণ থেকে যায়[২১]'। এছাড়া জাতিসংঘ অন্যান্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করার মাধ্যমে তথ্য অধিকারের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দেখছে, যাতে জনগনের অধিকার নিশ্চিত হয়।

বিশ্বব্যাংক

বিশ্বব্যাংক ১৯৮৫ সালে সর্বপ্রথম তার স্টাফদের মধ্যে তথ্য উন্মুক্তকরণের নির্দেশনা প্রদান করে। ১৯৯৩ সালে বিশ্বব্যাংক একটি বিস্তারিত তথ্য উন্মুক্তকরণ নীতিমালা গ্রহণ করে। এই নীতিমালায় উন্নয়ন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার গুরুত্বকে স্বীকৃতি দেয়া হয়।

বলা হয়-

---

২০ http://www.hri.ca

২১ http://www.hri.ca, p-9

'জনগণের অর্থের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে বিশ্বব্যাংক তাদের কাছে দায়বদ্ধ। শেয়ার হোল্ডারদের প্রশ্ন ও উদ্বেগ বিষয়ে ব্যাংককে দায়বদ্ধ হতে হবে'। ব্যাংকের প্রশাসনিক, আর্থিক নীতি, অথবা শেয়ার হোল্ডারদের বাহ্যিক হুমকি তৈরি করে এমন কোন বিষয় ব্যতীত অন্য যে কোন বিষয় জনগণের কাছে উন্মুক্ত করা যাবে।

সুতরাং দেখা যায় বিশ্বব্যাংকও তথ্য উন্মুক্তকরণের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখছে এবং জনগণের তথ্য অধিকারের বিষয়টি যাতে ক্ষুন্ন না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখছে।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন

ইউরোপীয় ইউনিয়ন একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা। গত কয়েক দশকে সংস্থাটি কিছু মৌলিক পরিবর্তন সাধন করে তার কাঠামোগত উন্নয়নে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের চুক্তি কার্যকর হয় ১৯৯৩ সালে। এখানে তথ্য প্রাপ্তির অধিকারটি নিশ্চিত করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে-

'সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করে। জনগণের বিশ্বাযোগ্যতা এর মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে[২২]'।

এরপর ১৯৯৯ সালে আমস্টার্ডামে নতুন একটি চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়, যা তথ্য প্রাপ্তির অধিকারকে কার্যকরভাবে স্বীকৃতি দেয়। এই চুক্তি তথ্য অধিকারকে প্রভাবিত করতে ইউরোপীয় পার্লামেন্ট ও ইউরোপীয় কাউন্সিল একটি নতুন আইন পাশ করে। এর ফলে তথ্য উন্মুক্তকরণ প্রক্রিয়ায় নাগরিকদের আরও ঘনিষ্টভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত করে এবং এতে প্রশাসনের বৈধতা নিশ্চিত হয়।

কমনওয়েলথ

রাজনৈতিক মূল্যবোধের অংশ হিসেবে সংস্থাটি গত এক দশকে মানবাধিকার ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সুর্নিদিষ্ট কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। কমনওয়েলথ রাষ্ট্রীয় তথ্যের অধিকারসহ তথ্য স্বাধীনতার গুরুত্বকে দুদশক কিংবা তারও বেশি সময় পূর্বে স্বীকৃতি দিয়েছে। ১৯৯৯ সালের মার্চে লণ্ডনে কমনওয়েলথ বিশেষজ্ঞ দলের বৈঠকে মানবাধিকার ব্যবস্থার অংশ হিসেবে তথ্য স্বাধীনতা ও তথ্য জানার অধিকার বিষয়ে কিছু মূলনীতি ও নির্দেশনা গ্রহণ করা হয়। উল্লেখ করা হয় যে -

'তথ্য স্বাধীনতাকে একটি আইনগত ও প্রয়োগযোগ্য অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া উচিত। যার ফলে প্রত্যেক নাগরিকই রাষ্ট্রের নির্বাহী, আইন ও বিচার বিভাগ থেকে নথিপত্র ও তথ্য পেতে পারে[২৩]'। সুতরাং দেখা যায়, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় জনগণের পূর্ণ অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা এবং জবাদিহিতামূলক শাসন প্রতিষ্ঠার তথ্যে জনগণের অধিকারকে কমনওয়েলথ অনেক আগে থেকেই স্বীকৃতি দিয়েছে।

ইউরোপিয়ান কাউন্সিল

ইউরোপিয়ান কাউন্সিল মানবাধিকার, শিক্ষা, ও সংস্কৃতির উন্নয়নের জন্য এ সংস্থা সৃষ্টি হয়েছে। সংস্থাটির অন্যতম ডকুমেন্ট হলো মানবাধিকার বিষয়ক ইউরোপীয় কনভেনশন European Convention On Human Right (ECHR)। এতে মৌলিক মানবাধিকার হিসেবে তথ্যের স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।

---

[২২] http://www.hri.ca, p. 29

[২৩] http://www.hri.ca, p.11

১৯৯৪ সালে গণমাধ্যম নীতি বিষয়ক চতুর্থ মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে একটি সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এতে গণমাধ্যম বিষয়ক স্টিয়ারিং কমিটিকে একটি বিধিবদ্ধ আইনগত কৌশল তৈরি করার নির্দেশ দেয়া হয় এবং সরকারী কর্তৃপক্ষের তথ্যে জনগণের অধিকারকে মৌলিক নীতিমালার সাথে সম্পৃক্ত অন্যান্য বিষয়কে বিবেচনা করতে বলা হয়। সুতরাং দেখা যায় তথ্য স্বাধীনতার অনুশীলনের ক্ষেত্রে ইউরোপিয়ান কাউন্সিল অনেক পথ এগিয়েছে।

এভাবে দেখা যায়, বিভিন্ন আর্ন্তজাতিক সংস্থা তথ্যের স্বাধীনতা, শিক্ষা-সংস্কৃতির উন্নয়নে তথ্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করে

তথ্য জানার অধিকারকে কার্যকর করার উপায়

তথ্যের অধিকার তখনই কার্যকর হতে পারে যদি তা আইনের দ্বারা নিশ্চিত করা যায়। শুধু আইন নয়, আইন প্রয়োগের রীতিপদ্ধতিকেও যথাযথভাবে স্থাপন করতে হবে। এসবের সাথে আরও কিছু বিষয় যুক্ত করতে হবে।

তথ্য জানার অধিকার কার্যকর করার ক্ষেত্রে যেসকল বিষয়কে সংশ্লিষ্ট করার কথা বলা যায় সেগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলোঃ

১. তথ্য উন্মুক্ত করার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ নীতিমালা।
২. তথ্য এবং জনপর্ষদের জোরালো সংজ্ঞায়ন।
৩. তথ্যের প্রধান বিষয়গুলো প্রকাশ সম্পর্কে ইতিবাচক বাধ্যবাধকতা।
৪. সংক্ষিপ্ত ও পরিষ্কার বিধিনিষেধ ।
৫. তথ্য অধিকার বিষয়ক পর্যবেক্ষণ কার্যকর প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে করতে হবে।
৬. দাপ্তরিক গোপনীয়তা আইনের সংস্কার এবং তদস্থলে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন।
৭. সামরিক তথ্য ও সাধারণ দাপ্তরিক তথ্যকে এক করে ফেলে উভয়কে একই ধরনের আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা সমীচীন হবে না।

উপসংহার

আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট হলো যে, তথ্য পাওয়ার অধিকার হচ্ছে মানবাধিকার, তথ্য হচ্ছে সকল উন্নয়নের ভিত্তি। এই তথ্য জানার অধিকার বিষয়ে আজকে সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশ, আঞ্চলিক বিভিন্ন সংস্থা, আর্ন্তজাতিক বিভিন্ন সংস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাপালন করছে এবং এর পক্ষে মতামত ব্যক্ত করছে। বাংলাদেশের সর্বস্তরে আজ দুর্নীতি, তথ্য গোপনের সংস্কৃতি বিরাজমান। প্রশাসনিক কর্মকর্তারা দাপ্তরিক গোপনীয়তা আইনের বলে কারণে-অকারণে তথ্য গোপন করে চলে আর নিজেদের অপরাধ আড়াল করার পাশাপাশি নিজেদেরকে রক্ষা করে চলেন। রাষ্ট্র ক্ষমতার উৎস সেই আপামর জনতা থাকে অন্ধকারে। সেই কারনেই জনগণ উন্নয়নে, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে সফল করতে কার্যকর কোনো ভূমিকা পালন করতে পারছে না। ফলে জাতি সামনে এগোতে পারছে না। বাধাগ্রস্ত হচ্ছে আমাদের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি। সুতরাং উন্নয়নের স্বার্থে, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সুশাসনের প্রয়োজনে ঔপনিবেশিক আমলের দাপ্তরিক গোপনীয়তা আইনের সংস্কার প্রয়োজন।